নীল পাথর (২)
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

নীল পাথর (২)-৫৫

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

অবাক হয় বনহুর, তার আস্তানায় তীর এলো কি করে! কে এই তীর নিক্ষেপ করেছে? তীরখানা তুলে নিলো বনহুর হাতে, দেখলো তীরফলকে একটা চিঠি গাঁথা আছে। চিঠিটা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো সে চোখের সামনে। চিঠিখানায় লেখা আছে ঃ

দস্যুসম্রাট, এ নীল পাথর
যেখানে আছে আমি জানি–
কিন্তু সে স্থান অতি ভয়ঙ্কর।
তবু তোমাকে ঐ পাথর
নিতেই হবে। নীল পাথর
তোমারই প্রাপ্য।

— আশা

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই মাংতুর মুখখানা। সে তাহলে এখানেও এসেছে! আশ্চর্য নারী এই আশা। কারও সাধ্য নেই তার আস্তানায় প্রবেশ করে, কিন্তু আশা বিনাদ্বিধায় প্রবেশ করেছে—নিশ্চয়ই সে আত্নগোপন করে আছে তার আস্তানার কোনো গোপন স্থানে। ইচ্ছা করলে বনহুর ওকে খুঁজে বের করতে পারে......বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে—হুর, তুমি এই নির্জন স্থানে চুপচাপ বসে আছো?

হাঁ।

ওটা কি তোমার হাতে?

নীল পাথর......

নীল পাথর?

হাঁ।

দেখি!

তুমি ওটা দেখে কিছু বুঝবে না নূরী, এটা একটা কাগজমাত্র।

বনহুরের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখে নূরী, তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বলে—আশ্চর্য, অদ্ভুত সংকেতপূর্ণ কাগজ এটা দেখছি!

নূরীর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পুনরায় বনহুর সেটা দেখতে থাকে। কিন্তু মন তার চলে গেছে দূরে, বহু দূরে কোনো অজানা অচেনা জায়গায়, যেখানে আছে ঐ নীল পাথর। আরও একটা চিন্তা তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছিলো—সে হলো আশা।

নূরী বনহুরের চিন্তাজাল পুনরায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বলে—হুর, এ কাগজ তুমি কোথায় পেলে?

বনহুর বৃদ্ধার সেই মোড়ক দেওয়ার কথা বিস্তারিত বললো নূরীর কাছে। তিন মাস পর মোড়কটি খুলে দেখার কথা বলেছিলো বৃদ্ধা, হয়তো সে বুঝতে পেরেছিলো সম্মুখে তার নানারকম বিপদ আছে—ও কাগজখানা খুলে নীলপাথরের সন্ধান পেলে সে নিশ্চয়ই চুপ থাকতে পারবে না।

সত্যিই নীল পাথর বনহুরকে উন্মত্ত করে তোলে। ভাবতে থাকে সে নীল পাথরের কথা।

নূরী বলে—কি ভাবছো?

নীল পাথরের কথা।

ও পাথরে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি জানি, নীল পাথর পাওয়া সে এক অসাধ্য সাধনা।

বনহুর হেসে বলে—অসাধ্য সাধন করাই যে আমার কাজ নূরী। নীল পাথরের স্বপ্ন আমি বহুদিন দেখেছি কিন্তু তেমন সুযোগ পাইনি সেটাকে উদ্ধার করার।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, আস্তানায় হঠাৎ বিপদ-সংকেত ধ্বনিত হয়।

মুহূর্তে বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

নূরীর চোখেমুখেও ফুটে ওঠে একটা দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনার ছাপ।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে রহমান, বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে—সর্দার, শীগ্‌গীর আসুন, এক্ষুণি আপনাকে দরবারকক্ষে যেতে হবে।

বনহুর একবার নূরীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলো রহমানের সঙ্গে।

নূরী ভেবে পেলো না কি হয়েছে।

বনহুর দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান একটি বাঁশীতে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন অনুচর এক যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে এলো তার সম্মুখে। যুবকটিকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। চোখেও কালো রুমাল বাঁধা।

দরবারকক্ষে বনহুর আর রহমান ছাড়া প্রায় চল্লিশজন অনুচর উপস্থিত ছিলো।

রহমান বললো—সর্দার, এই যুবক আশ্চর্য উপায়ে আমাদের আস্তানায় প্রবেশ করেছিলো, পালাবার সময় ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই এ গুপ্তচর।

বনহুর বললো—ওর চোখের বাঁধন খুলে দাও।

বনহুরের আদেশ পাওয়ামাত্র বন্দী যুবকটির চোখ থেকে কালো রুমালটা খুলে নেওয়া হলো।

বনহুর এবার তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো বন্দী যুবকটির মুক্ত দুটি চোখের দিকে।

যুবক তখন স্থিরদৃষ্টি মেলে বনহুরকে দেখছিলো।

বনহুর ওর দিকে তাকাতেই দৃষ্টি নত করে নিলো বন্দী যুবক।

বনহুর বললো—রহমান!

বলুন সর্দার

গুপ্তচরের শাস্তি কি?

রহমান সর্দারের মুখে এ প্রশ্ন শুনে অবাক হলো, তবু বললো—মৃত্যুদন্ড।

বনহুর বললো—যুবক, তুমি কোন্ সাহসে আমার আস্তানায় প্রবেশ করেছো?

যুবক নীরব।

বনহুর বললো—কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলে?

যুবক তবু কথা বললো না।

বনহুর বললো আবার—উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে মুক্তি সুনিশ্চয়—কথা বলো যুবক?

যুবক তবু নিরুত্তর।

বনহুর এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—নিয়ে যাও একে বন্দীশালায়, মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।

রহমান ইঙ্গিত করতেই অনুচরদ্বয় বন্দীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর এবার সেই সংকেতপূর্ণ কাগজখানা মেলে ধরলো রহমানের সামনে, তারপর বললো—এই যে কাগজখানা দেখছো, এটা লক্ষ্য করে দেখো।

রহমান কাগজখানায় লক্ষ্য করে বললো—ঠিক বুঝতে পারছি না সর্দার।

এটা নীল পাথর সংগ্রহের সংকেতপূর্ণ কাগজ।

নীল পাথর!

হাঁ।

সর্দার, ঐ পাথর নাকি বহু মূল্যবান......

হাঁ, কোটি কোটি টাকা।

শুনেছি নীল পাথর পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

সে এক অসাধ্য সাধন। রহমান, নীল পাথর আমার চাই। একটু চিন্তা করে বললো বনহুর—নীল পাথর পেতে হলে আমাকে কোরা পর্বতে যেতে হবে।

কোরা পর্বত? ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো রহমান।

হাঁ।

সর্দার, সে পর্বত নাকি হিম সাগরের ওপারে?

হিম সাগরের ওপারে বন্ধ্যা জঙ্গল আছে, তার মধ্যে সেই কোরা পবর্ত। কোরা পর্বতের কোনো এক গুহায় আছে নাগরাণী নামক একটি সাপ—তারই মাথার মনি নীল পাথর। কোরা পর্বত সাপের রাজা। অসংখ্য সাপ এ পর্বতে বাস করে।

বনহুরের কথা শুনে রহমানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। সর্দার যত শক্তিশালীই হোক, যত অসাধ্যই সাধন করুক না কেন, সাপের রাজ্যে গমন যে বড় ভয়ঙ্কর কথা! ভাবতেও শিউরে উঠে রহমানের শরীর। ঢোক গিলে বলে সে—ও নীল পাথর যে অভিশপ্ত সর্দার, কেউ কোনোদিন ও পাথর নিতে পারেনি বলেই জানি।

রহমানের কথায় বনহুর হেসে উঠলো, হাসি থামিয়ে বললো—কেউ পারেনি বলেই যে কেউ পারবে না তা নয়। রহমান, হিম সাগর পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। হাঁ, তার পূর্বে কতকগুলো কাজ আছে। নীলনদে আমাদের আটক পুলিশ জাহাজটার ব্যবস্থা করতে হবে। মিঃ জাফরী এবং তার সঙ্গীদের মুক্তির জন্য যে টাকা আমি দাবী করেছি, ঐ টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে না পেলে মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবলকে আমার জম্বু আস্তানায় আটক করে রাখতে হবে। ফিরে এসে তাঁদের ব্যবস্থা করবো। দ্বিতীয় কাজ, বন্দী মিঃ লিউকে মুক্তি দেবার পূর্বে তাকে কিছু শায়েস্তা করা। মাংতুর জাহাজ থেকে বিদায় নেবার সময় ক্যাপ্টেন লিউকে আমার জাহাজে এনেছিলাম এবং তাকে কান্দাই আস্তানায় রাখা রয়েছে।

রহমান বললো—সর্দার, ক্যাপ্টেন লিউকে মুক্তি দেওয়া কি ঠিক হবে?

কারণ?

সে মিঃ জাফরী এবং তাঁর দলবলের সব সংবাদ জানে। আরও জানে, তাঁরা নীল-নদে বন্দী আছেন।

তাতে কোনো অসুবিধা হবে না রহমান। ক্যাপ্টেন লিউ যা জানাবে তা আমি পূর্বেই পুলিশ মহলকে জানিয়েছি। এ কথাও আমি জানতে বাকি রাখিনি নীলনদের কোনো এক স্থানে তাদের জাহাজখানা আটক আছে। কাজেই ক্যাপ্টেন লিউ নতুন কোনো সংবাদ জানতে পারে না পুলিশের কাছে।

সর্দার, শুনেছি ক্যাপ্টেন লিউ নাকি আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো?

রহমানের কথায় বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি ফুটে উঠে, বলে সে—অবুঝ বালকের মত কথাটা বললো রহমান। বলো দেখি, কে আমাকে হত্যার চেষ্টা না করেছে? অবশ্য আমার কিছুসংখ্যক হিতাকাঙ্ক্ষী ছাড়া। পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তিই আছে যারা আমাকে হত্যার জন্য উন্মাদ। তাই বলে আমি কি তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারি? ক্যাপ্টেন লিউ তাদেরই একজন। একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—তৃতীয় কাজ হলো ফারহা শহরের সিরাজী হোসেনকে কিছু শায়েস্তা করা।

রহমান বলে উঠলো—সিরাজী হোসেন?

হাঁ, ফারহার ধনকুবের সিরাজী হোসেন। লোকটা মানুষ নয়, পশু। দেশবাসীর রক্ত শুষে নিয়ে সে আজ ফারহার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি। রহমান, প্রথম আমি সিরাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, তারপর মিঃ লিউ-এর সঙ্গে। এ সবের আগে কান্দাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার একান্ত প্রয়োজন।

সর্দার, কমিশনার ভবনের চারদিকে অত্যন্ত সতর্ক পাহারা রাখা হয়েছে। জানা গেছে, ঐ দিনের পর থেকে কমিশনার সাহেব সারা দিন ঘুমান আর সারা রাত জেগে থাকেন।

শুধু তাই নয়, তাঁর হাতে থাকে গুলীভরা রিভলভার। সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় থেকেও তাঁর স্বস্তি নেই, কারণ যে কোনো রাতে আমি তাঁর বাসভবনে গিয়ে হাজির হতে পারি এবং সেই রাত আজকের রাত, বুঝলে?

সর্দার!

হ্যাঁ, বিলম্বের সময় নেই। তাজকে তৈরি রাখো।
কথাগুলো বলে এগিয়ে যায় বনহুর সম্মুখের দিকে।
রহমান ফিরে যায় তার সঙ্গী-সাথীদের কাছে।

❑

উত্তেজনা আর আশঙ্কা নিয়ে কান্দাই কমিশনার আরিফ চৌধুরী তাঁর শয়নকক্ষের চেয়ারে বসে আছেন; দক্ষিণ হাতে তাঁর গুলীভরা রিভলভার, মাঝে মাঝে তিনি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন ওপাশের খাটে বিছানো দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানার দিকে। আজ কত রাত হলো তিনি শয্যা গ্রহণ করতে পারেননি। রাতের নিদ্রা তাঁর জন্য হারাম হয়ে গেছে। এত পাহারা পরিবেষ্টিত থেকেও সদা আতঙ্ক, কখন কোন্ মুহূর্তে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটবে কে জানে! বাইরে কোথাও কোনো শব্দ হলেই শিউরে উঠেন, ভয়ে কাঁপতে থাকে তাঁর সমস্ত শরীর।

সম্মুখের টেবিলে ফোন। রাতে ফোন এলে তিনি স্পর্শ করেন না, ভয় হয় যদি আবার সেই গলার স্বর তাঁর কানে ভেসে আসে!

কোনো কোনো সময় টেবিলে ফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠছে, ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে আরিফ চৌধুরী রিসিভারের দিকে। এ কক্ষে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছে। কাজেই ফোন একটানা বেজে চললেও মিঃ আরিফ চৌধুরী ছাড়া ফোন ধরবার জন্য কেউ ছিলো না।

রাত বাড়ছে।

সমস্ত কান্দাই নগরী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

দূর থেকে ভেসে আসছে কোনো সুদূরগামী ট্রেনের হুইসেলের শব্দ। কখনও শোনা যাচ্ছে ফাঁকা রাজপথে ছুটে চলা মোটরের আওয়াজ, থমথমে প্রহরগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিঃ আরিফ চৌধুরীর বুকও কাঁপছে অজানা এক আশঙ্কায়।

এত কড়া পাহারা সত্ত্বেও এত ভয় কেন কান্দাই কমিশনারের মনে? তিনি জানেন, দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। সে যা বলে তা করে,

ইতিপূর্বে পুলিশ মহল এ ব্যাপারে অনেক নজির পেয়েছে। কাজেই এত পাহারা পরিবেষ্টিত থেকেও আরিফ চৌধুরীর মনে স্বস্তি নেই।

চোখ দুটো যখন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে নিদ্রায় জড়িয়ে আসে, তখন তিনি চেয়ার ত্যাগ করে পায়চারী শুরু করে দেন কিন্তু কতক্ষণ এভাবে পায়চারী করবেন...একটি রাত নয়, আজ ক'রাত তাঁকে এরকম অস্থিরভাবে পায়চারী করতে হচ্ছে।

কি অসহ্য দুশ্চিন্তা, মিঃ আরিফ চৌধুরীর মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে যেন। মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবল নীলনদে জাহাজ সহ বন্দী আছেন—সে এক চিন্তা। যতক্ষণ না দস্যু বনহুরের দাবী পূরণ হয়েছে ততক্ষণ তাঁরা মুক্তি পাবেন না। অনেক চিন্তা করেও কোনো উপায় আবিষ্কার করতে পারেননি, দস্যু বনহুরের দাবী পূরণ করা ছাড়া বাঁচন নেই।

কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর চেয়ারে এসে বসলেন আরিফ চৌধুরী। রিভলভারখানা হাত থেকে টেবিলে রাখার সাহস হচ্ছে না তাঁর হাতখানা ধরে এসেছে সন্ধ্যা থেকে এই গভীর রাত পর্যন্ত একটানা রিভলভার হাতে নিয়ে রাখতে রাখতে।

কান্দাই কমিশনার যখন তাঁর শয়নকক্ষে হাঁপিয়ে উঠেছেন তখন তাঁর বাংলোর চারপাশে পাহারারত পুলিশ বাহিনী কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে।

বাংলোর সদর গেটে একজন রাইফেলধারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তার বুটের আওয়াজ লাল কাঁকড় বিছানো পথে খ্‌ট খ্‌ট আওয়াজ তুলছে। এপাশ ওপাশ করছে পুলিশটা।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি ধরে ফেললো ওকে, গলাটা বাম হাতে চেপে ধরে একটা হাস্‌নাহেনার ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলো। টু শব্দ করার সুযোগ পেলো না সে। ছায়ামূর্তিটি দ্রুতহস্তে খুলে নিলো পুলিশটির সংজ্ঞাহীন দেহ থেকে তার পোশাকটা, তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পুলিশের পোশাকটা পরে নিয়ে রাইফেল হাতে এগিয়ে এলো বাংলোর দরজায়।

বাংলোর হলঘরে পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি সবেমাত্র সোফায় দেহটা একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় সদর গেটের পুলিশ হলঘরে প্রবেশ করে সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিঃ হাশেম চমকে উঠে বসে বললেন—কিউঁ? তুম্ এঁহা?

পুলিশ-বেশী ছায়ামূর্তি বললো—অন্দরমে এক আদমী যানে দেখা।

কিয়া!

হাঁ স্যার, আপ দেখিয়ে না উধার। পুলিশ-বেশী ছায়ামূর্তি আংগুল দিয়ে ওদিকের জানালা দেখিয়ে দিয়ে কথাটা বললো।

মিঃ হাশেম যেই ওদিকে ঝুঁকে তাকিয়েছেন অমনি পিছন থেকে গলাটা তাঁর চেপে ধরে ভীষণভাবে চাপ দেয় ছায়ামূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করে এলিয়ে পড়ে তাঁর দেহটা ওর হাতের উপর। ও এবার মিঃ হাশেমকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে দ্রুতহস্তে খুলে ফেলে তাঁর দেহের ড্রেস, পরে নেয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। মাথার ক্যাপটা ওপাশের টেবিলে রাখা ছিলো, ওটা উঠিয়ে মাথায় পরে নেয়। বেরিয়ে আসে হলঘর ছেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পাহারারত সশস্ত্র পুলিশ সেলুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

মিঃ হাশেম-বেশী ছায়ামূর্তি বলে উঠে—তোমরা ঠিকমত পাহারা দাও, আমি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক্ষুণি ফিরে আসছি।

আচ্ছা স্যার। বলে পুলিশ কমান্ডার আলতাফ মাহমুদ।

আলতাফ মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষ কমান্ডার, তাই তাকে রাখা হয়েছে বাংলোর অভ্যন্তরের প্রবেশ পথে। কোনো রকমে যেন কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে।

মিঃ হাশেম-বেশী ছায়ামূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

আলতাফ মাহমুদ রাইফেল কাঁধে সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মিঃ হাশেম ফিরে আসবেন, কাজেই তার হুঁশিয়ারি মন্দা হলে চলবে না।

ওদিকে মিঃ আরিফ চৌধুরী সবেমাত্র চেয়ারে বসে মাথাটা টেবিলে রেখে একটু বিশ্রাম করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর পিছনে কারো অস্তিত্ব অনুভব করলেন—ফিরে তাকাতেই স্তম্ভিত হলেন তিনি চমকে উঠে বললেন—কে আপনি?

পুলিশ সুপার মিঃ হাশেমের ড্রেস পরিহিত এক অজানা ব্যক্তি—কে এ?

মিঃ আরিফ চৌধুরীর কথায় বললো মিঃ হাশেম-বেশী ছায়ামূর্তি—যার প্রতীক্ষায় আজ ক'রাত আপনার চোখে নিদ্রা নেই।

আপনি......আপনি তাহলে......

আপনি নয়, বলুন তুমি......কারণ আমাকে কেউ......

তুমি......তুমি......

হাঁ, আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর......টেবিলে রাখা রিভলভারের দিকে দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দেন মিঃ আরিফ।

অমনি বনহুর রিভলভারখানা তুলে নেয় হাতে। তারপর রিভলভারখানা মিঃ আরিফ চৌধুরীর বুকে চেপে ধরে বলে—খবরদার, কোনোরকম চিৎকার বা শব্দ করবেন না। বলেছিলাম বাংলোয় আসবো তাই এসেছি। এবার বলুন, আমার দাবী পূরণ করতে চান, না মিঃ জাফরী ও তাঁর দলবলের চির নির্বাসন কামনা করেন?

মিঃ আরিফ চৌধুরী ঢোক গিলে বললেন—তুমি যা চাও তাই পাবে।

ধন্যবাদ! একটু থেমে বললো বনহুর—কোনো রকম কারসাজি করতে যাবেন না যেন। কান্দাই পুলিশ মহলে অনেকেই এসেছেন, অনেকেই গেছেন। কান্দাই পুলিশ রিপোর্টে সকলের ভাগ্য সম্বন্ধে সবই অবগত হয়েছেন নিশ্চয়ই; কাজেই আপনার ভাগ্য আপনি নিজ হাতে কলঙ্কিত করবেন না। হাঁ, এরপর কবে কখন আবার আমাদের মিলন কামনা করেন, বলুন?

এ্যাঁ?

হাঁপাচ্ছেন কেন? ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

না, তবে......

বলুন তবে কি?

আমি তোমাকে চেক দেবো, তুমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নেবে।

ধন্যবাদ, তাহলেই চলবে; কিন্তু সাবধান, কোনোরকম চালাকি করতে যাবেন না যেন।

কমিশনার আরিফ চৌধুরী ফ্যাকাশে মুখে উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন তিনি সেল্‌ফের দিকে। সেল্‌ফের ড্রয়ার খুলে বের করলেন চেক বইখানা, তারপর চেকে সই দিয়ে চেকখানা বনহুরের হাতে দিলেন। বনহুরের হাতে চেকখানা তুলে দেবার সময় তাঁর হাতখানা কাঁপছিলো। তিনি ভাবছিলেন এত পাহারা মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও দস্যু তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো এবং তাঁকে সে ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারে।

বনহুর চেকখানায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পকেটে রাখলো, তারপর মাথার ক্যাপ খুলে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সিঁড়িতে বনহুরের বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মিঃ আরিফ তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে নিচে হলঘরে মিঃ হাশেমকে ফোন করলেন......হ্যালো......হ্যালো ......হ্যালো......

হলঘরে একটানা ফোন বেজে চলেছে ক্রিং ক্রিং ক্রিং কিন্তু ফোন করবে কে—মিঃ হাশেম তখন শুধু গেঞ্জি আর আন্ডারওয়ার পরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সোফায় লম্বালম্বি পড়ে আছেন।

বাংলোর চারপাশে সশস্ত্র পাহারাদার পুলিশ বাহিনী সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছিলো, কিন্তু হাশেম-বেশী দস্যু বনহুর সোজা বেরিয়ে এলো বাংলোর বাইরে।

পাহারারত পুলিশগণ সেলুট ঠুকে সরে দাঁড়ালো।

অদূরে থেমে থাকা গাড়িতে চেপে বসে ষ্টার্ট দেয় বনহুর।

একজন পাহারাদার বলে—কাঁহা যাতে হ্যাঁয় স্যার?

পুলিশ অফিসমে...কথাটা বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

অল্পক্ষণ পর হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে আসেন স্বয়ং কমিশনার আরিফ চৌধুরী, উচ্চকণ্ঠে শোর-হাঙ্গামা শুরু করেন—পাহারাদার পুলিশ তোমরা কি মরে গেছো, দস্যু বনহুর এসেছিলো, দস্যু বনহুর......মিঃ হাশেম...মিঃ হাশেম......

আরিফ চৌধুরীর চিৎকার শুনে চারদিক থেকে ছুটে এলো সশস্ত্র পুলিশরা, সকলের মুখে ভীষণ এক আতঙ্কের ছাপ।

মিঃ ইব্রাহীম পুলিশ ইন্সপেক্টার যিনি এতক্ষণ বাংলোর ছাদে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেলেন, তিনিও নেমে এসেছেন কমিশনারের চিৎকার শুনে। কমিশনার মিঃ আরিফ এবং ইন্সপেক্টর ইব্রাহীম উভয়ে এক সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করে হতবাক হলেন। দেখতে পেলেন মিঃ হাশেম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন সোফার পরে, তার দেহে জামা-কাপড় নেই।

এবার মিঃ আরিফ চৌধুরী বুঝতে পারলেন কেন তাঁর ফোন মিঃ হাশেম ধরেননি।

পরদিন সমস্ত শহরে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লো শত পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর কান্দাই পুলিশ কমিশনার ভবনে হানা দিয়েছিলো। দু'লাখ টাকার চেকখানার কথা মিঃ আরিফ সম্পূর্ণ চেপে গেছেন। কাজেই এ সংবাদ গোপন রয়ে গেলো।

❑

বনহুরের শহুরে আস্তানা।

একটি কক্ষে বন্দী অবস্থায় রয়েছে ক্যাপ্টেন লিউ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুলগুলো তৈলহীন রুক্ষ।

মিঃ লিউ চেয়ারে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো, সম্মুখের টেবিলে কতকগুলো পত্রিকা বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। মিঃ লিউয়ের হাঁটুর উপরে একটি পত্রিকা খোলা অবস্থায় রয়েছে। দস্যু বনহুরের কান্দাই পুলিশ কমিশনার ভবনে হানা সম্বন্ধেই এ পত্রিকায় লেখা হয়েছে, মিঃ লিউ এতক্ষণ ঐ সংবাদটিই পড়ছিলো আর ভাবছিলো দস্যু বনহুরের কথা। লোকটা সত্যি একটি বিস্ময়, অদ্ভুত তার চালচলন, অদ্ভুত তার কর্মদক্ষতা। কমিশনার ভবনে হানা দেওয়া কম কথা নয়! শত শত প্রহরী পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কি করে সে ঐ ভবনে প্রবেশে সক্ষম হলো ভেবে যে কেউ অবাক না হয়ে পারবে না।

মিঃ লিউ যখন এসব চিন্তা করছিলো তখন পিছনে কে যেন তাকে কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো ক্যাপ্টেন লিউ, অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো— দস্যু বনহুর!

হাঁ বন্ধু, আমি। বনহুর কথাটা বলে পাশের চেয়ারখানা সম্মুখে টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

মিঃ লিউ উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো, বনহুর ওকে পুনরায় হাত ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বললো—বসো বন্ধু, বসো।

ফ্যাকাশে মুখে বসে পড়লো মিঃ লিউ।

বনহুর বললো—ক্যাপ্টেন, কি চাও—মুক্তি না মৃত্যু?

মিঃ লিউ ঢোক গিললো।

বনহুর মিঃ লিউয়ের সম্মুখ থেকে পত্রিকাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর বললো—এখানে বসে সব সংবাদই জানতে পেরেছো মিঃ লিউ—কাল রাতের সংবাদটাও, কেমন?

হাঁ। অস্ফুট কণ্ঠে বললো মিঃ লিউ।

দেখো লিউ, তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। এখনও তোমার মনে আমাকে হত্যার নেশা ঘুরপাক খাচ্ছে। সুযোগ পেলে আমাকে বন্দী করে দু'লাখ টাকা পুরস্কারও নিতে পারো।

না না, আমি আর তোমাকে হত্যা করতে চাই না বনহুর, তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তুমি দস্যু হলেও তোমার মত মহৎ ব্যক্তি নেই। যে কোনো ব্যক্তি হলে সে এতদিন আমাকে হত্যা না করে জীবিত রাখতো না। তুমি রেখেছো, শুধু তাই নয়, আমার প্রতি কোনোরকম অসৎ ব্যবহার করোনি আমি তোমার শত্রু জেনেও......

মিঃ লিউফের কথায় হেসে উঠে বনহুর, তারপর বলে—তোমার মত অনেক ব্যক্তিই মৃত্যুভয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। যাক, সময় বেশি নেই, তুমি শীগ্‌গীর নিজকে পরিচ্ছন্ন করে নাও। যাও, পাশের কক্ষে সব কিছু পাবে।

বনহুর আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো ওপাশের একটি দরজা।

মিঃ লিউ সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। সে দেখতে পেলো নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে সেই কক্ষে। বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ লিউ নিজকে দেখলো অবাক বিস্ময়ে। এই ক'মাসে তার মধ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। পূর্বের সেই মিঃ লিউ যেন সে নয়।

মিঃ লিউ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো।

মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ নেই। পরিধেয় পোশাক ঝকঝকে পরিষ্কার। চোখে চশমা, মাথায় ক্যাপ। বনহুর এবার মিঃ লিউয়ের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর পকেট থেকে চেকখানা বের করে বাড়িয়ে ধরলো তার দিকে। বললো—এই চেকখানা পকেটে রাখো। আমার গাড়ি তোমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবে। সেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা নিয়ে ফিরে আসবে, তারপর তোমার ছুটি।

মিঃ লিউ চেকখানা হাতে নিয়ে চেকে নজর ফেলতেই দু'চোখ গোলাকার করলো, ভ্রুদুটি তার কপালে উঠে গেছে।

বনহুর মিঃ লিউয়ের পিঠ চাপড়ে বললো—দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে যে টাকা তুমি পাবার আশা পোষণ করতে সেই টাকা উল্টো দিকে গড়িয়ে গেলো, তাই না? চিন্তা করো না, আমি তোমার হাতের মুঠায় আছি, যখন খুশি তখন তুমি আমাকে পাকড়াও করে দু'লাখ টাকার মালিক হতে পারবে। যাও, বেশি দেরী করো না।

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে দু'জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালো মিঃ লিউফের দু'পাশে।

বনহুর বললো—মিঃ লিউ প্রস্তুত, এবার নিয়ে যাও।

প্রথম ব্যক্তি বললো—আসুন।

মিঃ লিউ একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে লোক দু'জনকে অনুসরণ করলো।

লোক দু'জন মিঃ লিউকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলো, তারপর তার চোখ দুটোকে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলো। মিঃ লিউকে ঐ ভাবেই এখানে আনা হয়েছিলো।

মিঃ লিউ এবং লোক দু'জন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

মিঃ লিউ অনুভব করলো সে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নিচে নেমে চলার পর আবার সে অনুভব করলো মেঝেটা যেন উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট একটানা চলার পর একটু ঝাঁকুনি দিয়ে মেঝেটা যেন থেমে গেলো।

তারপর মিঃ লিউকে নিয়ে কিছুটা এগুলো ওরা দু'জন। এরপর তার চোখের রুমাল খুলে দিলো।

মিঃ লিউ তাকালো সম্মুখে, দেখতে পেলো তারা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে জনমুখর রাজপথের এক পাশে। সামনে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার আসনে বসে আছে ড্রাইভার।

মিঃ লিউকে নিয়ে ভদ্রলোক দু'জন গাড়ির দিকে এগুলো।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

লোক দু'জন মিঃ লিউ সহ গাড়িতে উঠে বসলো।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠাতে বেশি বেগ পেতে হলো না মিঃ লিউয়ের। কমিশনারের সইসহ চেক, তাছাড়া ক্যাপ্টেন লিউ স্বয়ং এসেছেন ব্যাঙ্কে, তাঁকে বিলম্ব করানো চলবে না।

টাকা ব্যাগে ভরে নিয়ে মিঃ লিউ ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। ভদ্রলোক দু'জনও বসলো তার দু'পাশে।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

মিঃ লিউ যখন ব্যাঙ্ক থেকে একসঙ্গে দু'লাখ টাকা নিয়ে ব্যাগে ভরছিলো তখন দূর থেকে একজন লোক লক্ষ্য করছিলো তাকে। মিঃ লিউ গাড়িতে উঠে বসতেই সেই লোকটি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। শিস্ দিলো লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন গুন্ডা লোক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। লোকটা ইশারায় দেখিয়ে দিলো মিঃ লিউয়ের গাড়িটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, লোকগুলো অদূরে থেমে থাকা একটা গাড়িতে উঠে বসলো।

একজন ড্রাইভ আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো। লিউয়ের গাড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে গাড়ি চলাতে লাগলো ওরা।

মিঃ লিউয়ের গাড়ি উল্কাবেগে ছুটে চলেছে।

পিছনের গাড়িখানা তাদের গাড়িকে অনুসরণ করে দ্রুতবেগে এগুচ্ছে।

মিঃ লিউয়ের গাড়ির ড্রাইভার সম্মুখের আয়নাখানা বাম হাতে একটু কাৎ করে দিলো। এবার সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পিছনের গাড়িখানাকে।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে এপথ সেপথ করে একটা নির্জন পথে নিয়ে এলো।

মিঃ লিউয়ের সঙ্গীদ্বয়ের একজন বললো—একখানা গাড়ি আমাদের গাড়িখানাকে অনুসরণ করছে।

অপরজন বললো—ঠিক বলেছো, গাড়ির মধ্যে কয়েকজন দুষ্ট ব্যক্তি আছে এবং তারা আমাদের গাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ডাইভারকে লক্ষ্য করে বললো লোকটা—এ নির্জন পথে এলে কেন ড্রাইভার?

ড্রাইভার সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো—পিছনের গাড়িখানার দৃষ্টি এড়াবার জন্যই আমি এ নির্জন পথে এলাম।

মিঃ লিউ বললো—ড্রাইভারের গতিবিধি ভাল মনে হচ্ছে না, নিশ্চয়ই এ লোকটা ওদেরই দলের লোক। কথাগুলো ক্যাপ্টেন লিউ ফিস ফিস করে বললো সঙ্গীদ্বয়ের কানে।

এক্ষণে ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে একেবারে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। গাড়ির গতিও মন্দা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পিছনের গাড়িখানা একেবারে এসে পড়েছে, স্পীডে গাড়িখানা এগিয়ে আসছে।

মিঃ লিউয়ের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে লাগছে। তার টাকাগুলো সম্বন্ধে যে ওরা জানতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টাকাগুলো আর কারও নয়—দস্যু বনহুরের, কাজেই মিঃ লিউ বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

মিঃ লিউ জানে, এ টাকার বিনিময়ে সে প্রাণ ভিক্ষা পাবে। না হলে সে ব্যাঙ্কে গিয়ে পুলিশকে ফোনে সব জানিয়ে দিতে পারতো কিংবা ব্যাঙ্কেও জানাতে পারতো নিজের বিপদের কথাটা। কিন্তু সে তা করেনি, করলে দস্যু বনহুর তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতো না।

মিঃ লিউয়ের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, গাড়িখানা থেমে পড়ে আচম্বিতে।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের গাড়িখানা এসে তাদের গাড়ির সম্মুখে পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন গুন্ডা লোক লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ছোরা হস্তে, আক্রমণ করে আচমকা মিঃ লিউ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে।

ড্রাইভার মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুন্ডাদের উপর আক্রমণ চালায়। এক-একজনকে টেনে নিয়ে এক-একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয় নাকে মুখে। কারও বা চোয়ালে, কারও বা চোখে, কারও বা দাঁতে। রক্তের ফোয়ারা ছোটে ওদের চোখে, মুখে, দাঁতে। হাতের ছোরা ছুঁড়ে ফেলে কে কোন্ দিকে পালাবে, পথ পেলো না।

মিঃ লিউ এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো নিজের আসনে। চোখেমুখে তার বিস্ময়, একটা সামান্য ড্রাইভারের দেহে এত শক্তি। প্রাণের মায়া একরকম ত্যাগই করেছিলো সে। তার সঙ্গীদ্বয়ও চুপ ছিলো না, তারাও লড়াই করে চলেছিলো প্রাণপণে। তবে ড্রাইভারের সঙ্গে পেরে উঠলো না কেউ।

গুন্ডাদল অন্তর্ধান হতেই ড্রাইভার এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন লিউ এর পাশে, মাথার ক্যাপটা খুলে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেলছিলো সে তখন।

মিঃ লিউ চমকে উঠলো, এ যে স্বয়ং দস্যু বনহুর! তবে এতক্ষণ তাদের গাড়িখানা বনহুর নিজে চালিয়ে নিয়ে আসছিলো। অবাক হয়ে যায় মিঃ লিউ, এবার সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে।

বনহুর গুন্ডাদের শায়েস্তা করার জন্যই ঠিকপথে না গিয়ে এই নির্জন পথে এগিয়ে এসেছিলো গাড়িখানা নিয়ে।

এবার বনহুর মিঃ লিউকে উদ্দেশ্য করে বললো—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, না?

হাঁ, ভেবেছিলাম আজ বুঝি আর রক্ষা নেই। টাকাগুলোর সঙ্গে প্রাণটাও হারালাম।

যাক, প্রাণ তো হারাননি, এবার কোথায় যাবেন বলুন?

সত্যি আমাকে মুক্তি দিলে তুমি?

হাঁ, শুধু আপনি নন, আপনার জাহাজখানাসহ আপনার সঙ্গীসাথীদেরকেও আমি মুক্তি দিলাম—কারণ আমার যা পাওনা তা পেয়েছি। বনহুর এবার তার অনুচরদের একজনকে লক্ষ্য করে বললো—একে এর বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসো।

বনহুরের আদেশ পেয়ে একজন ড্রাইভ আসনে চেপে বসলো, তারপর গাড়ি ছাড়লো।

বনহুর মিঃ লিউকে লক্ষ্য করে বললো—বিদায় বন্ধু......হাত নাড়লো বনহুর।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

বনহুর এবার আর একজন সঙ্গীসহ গুন্ডাদের ফেলে যাওয়া গাড়িখানায় চেপে বসলো।

❑

ফারহা শহর।

বিরাট শহর এই ফারহা। এখানে লাখ লাখ লোকের বসতি। নানা দেশের মানুষ বসবাস করে এখানে। ফারহার সবচেয়ে ধনী সিরাজী হোসেন এসেছিলেন কোন এক অখ্যাত পল্লী থেকে সামান্য ব্যবসা নিয়ে। এখন তিনি কোটিপতি।

লাখ লাখ লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে সিরাজী হোসেন ফারহার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। ফারহার বুকে তাঁর কয়েকটা ব্যবসা চলছে। প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা তাঁর আয়।

সিরাজী হোসেন বহু অর্থের মালিক হলেও তাঁর মত হীন মনা মানুষ বুঝি আর হয় না। তাঁর কারখানায় শত শত অসহায় ব্যক্তি প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে কিন্তু তাদের নামমাত্র অর্থ দেন সিরাজী হোসেন। কোনোদিন তিনি গরিবদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন না, বরং গরিবদের দেহের রক্ত শুষে নেন নির্বিকার চিত্তে।

কত নিরীহ অসহায় লোককে এই সিরাজী সাহেব পথে বসিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সিরাজী যখন ফারহায় প্রথম আসেন তখন তার সম্বল ছিলো মাত্র পঁচিশ টাকা। একটি জামা, পাজামা আর একটা আধ ময়লা কোট ছিলো গায়ে। পথে পথে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ানোর পর হঠাৎ এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ ঘটে। ওকে আদর-যত্ন করে বাড়ি নিয়ে যান সেই পরিচিত ব্যক্তি ইউসুফ আলী। সেখানে সিরাজী হোসেন আপনজনের মত ইউসুফ আলীর সঙ্গে এক হয়ে যান। ইউসুফ ছোটখাটো একটা ব্যবসা

করতেন, সিরাজী তার পঁচিশ টাকা ওর ব্যবসার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একজন পার্টনার সেজে বসলেন। দিন যায়-ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে। সিরাজী অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন, তিনি পঁচিশ টাকার মালিক হয়ে গদি জেঁকে বসলেন আর ইউসুফ আলী সদাসর্বদা পরিশ্রম করে মরতেন। দিনের পর দিন ব্যবসা যখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে তখন সিরাজীর মাথায় খেললো কি করে তাকে ব্যবসা থেকে দূরে সরাবেন। একদিন রাতের অন্ধকারে সিরাজী তাঁর বন্ধুকে হত্যা করলেন তাঁর মাল গুদামের মধ্যে, তারপর বন্ধুর লাশটিকে বস্তায় ভর্তি করে অন্যান্য মালের সঙ্গে গাড়িতে নিয়ে গেলেন শহরের বাহিরে। বস্তাসহ এক নদীতে নিক্ষেপ করে ফিরে এলেন।

হঠাৎ বন্ধুর অন্তর্ধানে বন্ধু পরিবার একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। সিরাজী হোসেন চোখে থুথু দিয়ে মিছামিছি রোদন করার ভান করে শোক প্রকাশ করলেন। তারপর সমস্ত ব্যবসা একদিন নিজের করে নিলেন।

তারপর আরও কতজনকে সিরাজী হোসেন পথের ফকির করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পথের ফকির করেছেন বন্ধুর পত্নী ও তাঁর অসহায় সন্তানদের।

আজ সিরাজী হোসেন মাথায় টুপি পরে একমুখ দাড়ি রেখে বিড়াল তপসী সেজে বসেছেন কিন্তু মন তাঁর বিষাক্ত সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সিরাজী হোসেন নামাজ পড়েন, রোজা করেন, হজ্বও করেছেন কয়েকবার, কপালে কালো দাগ পড়ে গেছে জায়নামাজে কপাল ঠুকে ঠুকে।

অন্যান্য দিনের মত আজও সিরাজী তাঁর তিন তলার কক্ষে বসে নামাজ পড়ছিলেন। যদিও তিনি সেজ্দার পর সেজ্দা করে চলেছেন কিন্তু মনট তাঁর চলে গেছে ব্যবসার হিসেবের খাতায়। কত টাকা আজকের আয় এখনও সে হিসেব মিলানো হয়নি। তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে হিসেবের খাতা নিয়ে বসবেন। পাশেই তাঁর খাতাপত্র স্তূপাকার করা রয়েছে।

বিভিন্ন কারবারের ভিন্ন ভিন্ন ম্যানেজার তারা সবাই প্রতীক্ষা করছে পাশের কামরায়। প্রতিদিন এমনি করে রাতের বেলায় আসতে হয় তাদের হিসেব মিলাতে। রাতের পর রাত কেটে যায় তাদের এমনি করে হিসেব-নিকেশ করতে।

অন্যান্য দিনের মত আজও অপেক্ষা করছে সবাই, কখন নামাজ শেষ হবে তাদের ফেরেস্তাসম ম্যালিক সিরাজী সাহেবের।

সেজদার পর সেজদা দিচ্ছেন আর পাশে রাখা ফাইলটার দিকে বাঁকা নজরে তাকাচ্ছেন, না জানি আজ কত টাকার অঙ্ক বেড়েছে!

সিরাজী সাহেব তিনতলার মজবুত একটি কক্ষে থাকেন। গেটে রাইফেলধারী পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও অন্দরবাড়ির গেটে আরও দু'জন পাহারাদার মোতায়েন রেখেছেন, কারণ কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে! সদা কেমন যেন একটা ভয় তাঁর মনকে চাপা দিয়ে রেখেছিলো। বিশ্বাস করতেন না সিরাজী সাহেব কাউকে।

সিরাজী হোসেন তাই বেছে নিয়েছিলেন উপরতলার মাঝের কক্ষটা নিজের জন্য। এ কক্ষে সহসা কারও প্রবেশ নিষেধ ছিলো, শুধু তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রবেশ করতো। তবু সিরাজী সাহেব নিজে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে কক্ষে নিতেন।

আজ সিরাজী সাহেবের মনটা বড় ভাল ছিলো না, কারণ তাঁর পুরানো পার্টনার বন্ধু ইউসুফ আলীর বিধবা পত্নী এসেছিলেন তাঁর বাড়ির দরজায় কিছু সাহায্য কামনা করে। আজ তাঁর সন্তান কঠিন রোগে মৃত্যুপথ যাত্রী, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হচ্ছে না। ঘরে খাবার নেই, পথ্যের কোনো জোগাড় নেই। কিছু না দিলেই নয়, কেঁদে পড়েছিলেন ইউসুফ-পত্নী তাঁর পায়ে। সিরাজী তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও মনে কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ তিনি জানেন, এ অর্থ আর ঐশ্বর্য আসলে কার। মন থেকে ইউসুফ-পত্নীর চিন্তা দূর করার জন্যই আজ বেশি করে এবাদতে মশগুল হতে চাচ্ছিলেন সিরাজী সাহেব।

নামাজ শেষ করে মুখ ফেরাতেই চক্ষু তাঁর স্থির হয়ে গেলো, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর সমস্ত মুখখানা। জমকালো পোশাক পরা একটি লোক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে!

সিরাজী হোসেন ফ্যাকাশে মুখে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—কে!

জমকালো মূর্তি জবাব দেবার পূর্বেই তার পাঁজরে রিভলভারের হিমশীতল আগাটা এসে ঠেকলো, তার সঙ্গে জবাব এলো—তোমার যমদূত।

জমকালো মূর্তির গম্ভীর কণ্ঠস্বর শিউরে উঠলো সিরাজীর অন্তরাত্মা। দেহখানা কাঁপছে বেতসপত্রের মত থরথর করে, আমতা আমতা করে বললেন—কি চাও আমার কাছে?

তোমার জান।

এ্যাঁ—এ্যাঁ—তুমি......তুমি......কে?

দস্যু বনহুর।

এ্যাঁ......দস্যু বনহুর!

হাঁ।

তুমি—তুমি—ফারহা এসেছো?

দেখতেই পাচ্ছো স্বয়ং তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

তুমি যাও, আমি এখন নামাজ পড়ছি। যাও......

আমি অনেকক্ষণ এসেছি এবং তোমার নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রয়েছি। খবরদার, কোনোরকম চিৎকার বা শব্দ করবে না।

তুমি কি করতে চাও?

তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত......

আমি—আমি কোনো পাপ করিনি। আমি হজ্ব করেছি, নামাজ পড়ি, রোজা রাখি......পাপকে আমি ঘৃণা করি।

বনহুর চাপাকণ্ঠে হেসে বললো—তোমার পাপের হিসেব তুমি না রাখলেও আমার হিসেবে সব লিখা আছে। কত পাপ তুমি করেছো জানতে চাও?

ঢোক গিলে বলেন সিরাজী সাহেব—অজান্তে যদি কোনো পাপ করে থাকি......

অজান্তে হলে আমার খাতায় তোমার পাপের হিসেব উঠতো না। সব জেনে তুমি যা করেছো তা চরম পাপ।

আমি—আমি—কি পাপ......

চুপ! একটি কথা আর বলবে না। মনে মনে স্মরণ করে দেখো কি পাপ তুমি করেছো। নামাজ পড়লেই, রোজা করলেই বা হজ্ব আদায় করলেই সে নেককার হয় না যদি তার মন পবিত্র না হয়। পরের অন্যায় করে যে সৎকাজ করে সে সৎকাজ পাপেরই শামিল। এই ঐশ্বর্য, অর্থ-সম্পদ তোমার নয় অথচ তুমি সেই অর্থে হজ্ব করেছো, কাজেই সে হজ্ব তোমার সত্যিকারের হজ্ব হয়নি। এই ঐশ্বর্য উপভোগ করে নামাজ পড়ছো, এই নামাজ তোমার সত্যিকারের এবাদত নয়। এই সম্পদ থেকে তুমি খাদ্য ভক্ষণ করে রোজার এফ্‌তার ও ছেহেরী করছো কাজেই সে রোজা তোমার উপবাসেরই শামিল। তোমার বিচার আমি করতে চাই না, শুধু তোমাকে হত্যা করে পরপারে পাঠিয়ে দিতে এসেছি; বিচার করবেন সেই বিচারক। বনহুর আংগুল দিয়ে উপরের দিকে দেখিয়ে কথাটা শেষ করলো।

সিরাজীর দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তিনি সংজ্ঞাহীনের মত বনহুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। অসহায় চোখে তাকাচ্ছিলেন

এদিক ওদিক। দস্যু বনহুরের হাতে আজ তাঁকে প্রাণ দিতে হবে ভাবতেও পারেননি কোনোদিন। এতদিন নিশ্চিন্ত মনে শুধু অর্থ সঞ্চয়ই করেছেন। আজ তাঁকে এমন এক অবস্থায় পড়তে হবে, এ যেন কল্পনাতীত। এত সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর কি করে তিনতলায় তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো ভেবে সিরাজী হোসেন অবাক হচ্ছেন। বনহুরের আবির্ভাব তাঁর হৃৎপিণ্ডকে যেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলো, এলোমেলো সব চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছিলো। এখন কি করবেন, কি বলবেন তালগোল পাকিয়ে আসছে সব। দস্যু বনহুরের রিভলভারের আগাটা আজরাইলের হাতের মত ঠান্ডা মনে হচ্ছে সিরাজীর কাছে।

বনহুর বললো আবার—কি ভাবছো, কখন হিসেব-নিকেশ হবে? ম্যানেজাররা তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। কিন্তু হিসেব আর মিলানো হলো না। অবশ্য দুটো পথ এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে, এর একটি তুমি বেছে নিতে পারো।

সিরাজী উঠে দাঁড়ালেন, দু'চোখে তাঁর ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিলো। তাকালেন তিনি বনহুরের কালো আবরণে অর্ধঢাকা মুখের খোলা অংশের দিকে। একজোড়া ভ্রু নিচে বুদ্ধিদীপ্ত নীল দুটি চোখ, চোখ দুটি যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করে গেছে।

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো—একটি হলো তোমার জীবন, অপরটি হলো তোমার সম্পদ—বলো তুমি কোন্‌টা চাও?

বনহুরের কথা যেন বুঝতে পারেন না সিরাজী হোসেন, তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে থাকেন।

বনহুর বলে—আর কয়েক মিনিট আমি অপেক্ষা করবো। ন্যাকামি না করে সোজাসুজি বলো। তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য-ঐশ্বর্য সব তোমার মৃত বন্ধু ইউসুফ আলীর পরিবারকে ছেড়ে দিতে হবে, যদি এতে স্বীকার না হও তাহলে প্রাণ দিতে হবে—বলো এর কোন্‌টা চাও?

এবার সিরাজীর মুখে কে যেন এক পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে দিলো।

বনহুর ওকে নীরব থাকতে দেখে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো—তিন মিনিট সময় দিলাম তোমাকে ভেবে দেখার জন্য।

এখানে বনহুর আর সিরাজী হোসেনের মধ্যে যখন আলাপ চলছিলো তখন অপর একটি কক্ষে সিরাজীর ম্যানেজাররা বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছিলো। এশার নামাজ পড়তে এত বিলম্ব আর কোনোদিন তো হয়নি,

আজ এত দেরী হচ্ছে কেন! কেউ বা ঝিমুচ্ছে, কেউ বা বসে বসে হাই তুলছে, আবার কেউ বা পায়চারী করছে ঘুম পাচ্ছে বলে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো, মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে এলেন সিরাজী হোসেন সেই কক্ষে।

চমকে উঠে দাঁড়ালো ম্যানেজারগণ, সবাই হতবাক হয়ে তাকাতে লাগলো—কি ব্যাপার, মালিক নামাজ পড়তে গিয়ে এমন হয়ে পড়েছেন কেন! হঠাৎ কি হলো, কোনো অসুখ-বিসুখ হলো নাকি?

উদ্বিগ্ন হয়ে একজন বলে উঠলো—মালিক, কি হয়েছে?

কি হলো মালিক? সবাই একযোগে বলে উঠলো।

সিরাজী হোসেন ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা সোফায়। ঘেমে নেয়ে উঠেছেন তিনি, চোখমুখ বিবর্ণ, মরার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

ম্যানেজারগণ কেউ বা ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিলো, কেউ বা তার বুকে-পিঠে হাত বুলাতে শুরু করলো। কেই বা ছুটলো নিচে পরিবার পরিজনকে সংবাদ দিতে, কেউ বা ফোন করলো ডাক্তারের কাছে।

সিরাজী হোসেন শুধু হাঁপাচ্ছেন, কোনো কথা বলছেন না। তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন।

সিরাজ সাহেবকে একটি শয্যায় শয়ন করানো হলো। ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করে কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা। ডাক্তাররা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পাচ্ছেন না।

সিরাজী সাহেবকে তাঁর নিজের কক্ষে শোয়ানো হয়েছে, তিনি বারবার তাকাচ্ছেন কক্ষের পিছনের জানালার দিকে। চোখেমুখে তাঁর ভয় আর আতঙ্কের ছাপ।

পরিবার পরিজন কাঁদছে।

ডাক্তারগণ ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিয়ে চলেছেন। কিন্তু রোগীর মধ্যে কোনোরূপ আরোগ্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি কিছু যেন বলতে চান কিন্তু বলতে পারছেন না, শুধু তাকাচ্ছেন পিছন জানালাটার দিকে।

এক ডাক্তার বললেন—ঐ জানালাটা বন্ধ করে দিন, আমার মনে হচ্ছে, সিরাজী সাহেব ঐ জানালায় এমন কিছু দেখেছেন যা তাঁর মনকে ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে।

সমস্ত রাত কাটলো অস্থিরভাবে। পরদিন সিরাজী হোসেনকে অনেকটা স্বাভাবিক মনে হলো কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হচ্ছে, তিনি যেন এইমাত্র

কবর থেকে উঠে এসেছেন। চোখ দুটো বসে গেছে, চোয়াল বেরিয়ে পড়েছে। রুক্ষ চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত, দাড়িগুলো যেন একরাতের মধ্যে সব পেকে সাদা হয়ে পড়েছে।

সিরাজী হোসেন সকালে পরিবার-পরিজন সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন নিজের পাশে। সরকার, ম্যানেজার সকলকে ডাকলেন। মৃত্যুর পূর্বে যেমন মুমূর্ষু রোগী তার পরিবার-পরিজনকে ডেকে সব কথা বলে, তেমনি করে সিরাজী হোসেন সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন।

অবাক হয়ে গেলো সবাই।

সিরাজী হোসেন তাঁর পুরানো বন্ধু ইউসুফের পত্নী ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরও ডাকালেন। ব্যাপার কি কেউ বুঝতে পারছে না।

সিরাজী হোসেন এবার বন্ধু ইউসুফের পত্নীর হাত ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। হঠাৎ আজ সিরাজী হোসেন ইউসুফের পত্নীর কাছে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লেন কেন, কেউ বুঝতে পারে না। ইউসুফের পত্নী নিজেও বিস্মিত হন—কাল যে তাঁকে চরম অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, তাঁর রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার জন্য সামান্য কিছু সাহায্য করতে রাজি হয়নি, আজ সেই সিরাজীর মধ্যে এমন পরিবর্তন—অবাক হবার কথাই বটে!

সিরাজী হোসেন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ভাবী সাহেবা, আজ থেকে এই বিষয়-আশয় ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু তোমাদের। এ বাড়িঘর সব তোমাদের, আজ থেকে এ বাড়িতে তোমরা বাস করবে।

ইউসুফের পত্নী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—এসব কি বলছো ভাই?

হাঁ, সব তোমাদের। সরকার ও ম্যানেজারদেরকে ডেকে বললেন এবার সিরাজী হোসেন—আজই সব উইল করে দেবো ইউসুফ আলীর ছেলের নামে......

একি বলছেন মালিক? বললো সিরাজীর কর্মচারীবৃন্দ।

সিরাজী হোসেন বললেন—যা বলছি তাই করুন আপনারা।

একজন বললো—মালিক, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

না, আমার মাথা খারাপ হয়নি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

সিরাজীর পত্নী হাউমাউ করে কেঁদে বললো—বাড়িঘর সব যদি ইউসুফদের দিয়ে দেবে তাহলে আমরা থাকবো কোথায়?

পথ! আমাদের জন্য পথে আশ্রয় আছে।

খাবে কি? ছেলেমেয়ে নিয়ে খাবে কি তুমি?

আল্লাহ যা খাওয়ায় তাই খাবো। ভিক্ষা করে খাবো.....কাঁদতে কাঁদতে বললেন সিরাজী হোসেন।

সবাই মনে করলো সিরাজী হোসেনের মাথা খারাপ হয়েছে। ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—না, তাঁর মাথা খারাপ হয়নি।

সিরাজী হোসেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিলেন নিজ হাতে নিহত বন্ধু ইউসুফ আলীর সন্তান-সন্ততিদের নামে। তারপর রিক্ত হাতে বেরিয়ে গেলেন তাঁর রাজপ্রাসাদসম বাড়ি থেকে। কেউ জানলো না কেন হঠাৎ সিরাজী হোসেনের মধ্যে এমন পরিবর্তন এলো।

❑

শিশু জাভেদের সঙ্গে খেলা করছিলো বনহুর।

একটা ছোট্ট বল নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো বনহুর, জাভেদ ছুটে গিয়ে বলটা কুড়িয়ে এনে পিতার হাতে তুলে দিয়ে হেসে উঠছিলো খিল খিল করে।

বনহুরও জাভেদের সঙ্গে হাসছিলো প্রাণ খুলে ছোট্ট শিশুর মতই।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় সেখানে। সর্দারকে ছোট্ট শিশুর সঙ্গে শিশুর মতই খেলা করতে দেখে আনন্দ লাভ করে সে। যে সর্দারের ভয়ে দেশবাসী কম্পমান, যে সর্দারের শক্তি তাদের শত শত দস্যুশক্তিকে হার মানায়, সেই দস্যু বনহুর—এখন যেন সে দস্যু নয়।

অবাক হয়ে রহমান তাকিয়ে ছিলো সর্দার আর জাভেদের দিকে। তার চোখেমুখেও খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে।

রহমান দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

এমন সময় নূরী সেখানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, রহমান ঠোটে আংগুল রেখে তাকে বাধা দিয়ে বলে—যেও না নূরী, সর্দার এখন ব্যস্ত আছেন।

নূরীও তাকিয়ে দেখে স্বামী আর সন্তানের এই অপূর্ব খেলার দৃশ্য! বনহুরকে বড় সুন্দর লাগছিলো। আপন ভোলা চেহারা শরীরে সামান্য ড্রেস—পা-জামা আর পাঞ্জাবী, পায়ে স্যাণ্ডেল—কে বলবে এই সেই দস্যু যে গত রাতে ফারহা শহরে উপস্থিত হয়ে সিরাজী হোসেনের জীবনে এনেছে

বিরাট পরিবর্তন। যার একটি কথায় শয়তান সিরাজী তাপস বনে গেছেন। দু'লাখ টাকা এবং মিঃ লিউকে উদ্ধার করতে গিয়ে যে কয়েকজন গুণ্ডাকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। যে বনহুর কয়েকদিন আগে কান্দাই কমিশনার ভবনে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করে কমিশনারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলো, এক্ষণে একে বলবে এই বনহুর সেই বনহুর।

রহমান আর নূরী যখন দস্যু বনহুরের সঙ্গে জাভেদের খেলা দেখছিলো তখন হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় তাদের দিকে। এবার বনহুর বলটা জাভেদের হাতে দিয়ে বললো—যাও, আম্মীর সঙ্গে এবার খেলা করবে, যাও।

জাভেদ মাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জাপটে ধরে।

নূরী ওকে তুলে নেয় কোলে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলে—আব্বুর সঙ্গে খেলা হচ্ছিলো বুঝি?

জাভেদ তখন নেমে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর রহমানকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে বাইরে।

একটা নির্জন স্থানে এসে বসলো বনহুর আর রহমান।

বনহুর বললো—রহমান, আপাততঃ আমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছি। কিছু বাকি আছে, ফিরে এসে করবো।

রহমান বললো এবার—সর্দার, আপনার আদেশমত আমি সবকিছু প্রস্তুত করে নিয়েছি। জাহাজ 'জবরু' নিয়েই আমরা রওয়ানা দেবো।

হাঁ, জবরুই হিমসাগর পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে ভাল হবে। এ জাহাজে আমাদের প্রয়োজনীয় সব আছে। ক'জন অনুচর আমাদের সঙ্গে থাকবে?

বিশজনকে নেওয়া মনস্থ করেছি সর্দার। পাঁচজন আমরা, আর পনেরজন জাহাজের খালাসি ও চালক হিসেবে কাজ করবে।

অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর সঙ্গে নিও রহমান, কারণ অনেক বিপদকে এগিয়ে তবেই নীল পাথর......বুঝেছো?

বুঝেছি সর্দার এবং সেইমতই আমি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি।

বেশ।

সর্দার, আপনি একবার যাবেন না 'জবরু' দেখতে?

যাবো, রওয়ানা দেবার পূর্বে যাবো। কিন্তু তার পূর্বে আমাকে কান্দাই যেতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললো—মায়ের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে রহমান।

হাঁ সর্দার, এ আপনার কর্তব্য।

রহমান, আপাততঃ নূরীর কাছে সব গোপন রাখবে।

সে সব জেনে ফেলেছে......

কবে কখন কিভাবে রওয়ানা দিচ্ছি তাও জেনে ফেলেছে নূরী?

ঠিক সব জানে না, তবে সে এটুকু জানে, আপনি নীল পাথর উদ্ধারে অল্পদিনের মধ্যে রওয়ানা দেবেন।

একটা গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠে বনহুরের ললাটে, ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে—প্রথমেই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিলো—নীল পাথর সম্বন্ধে নূরীর কাছে সব কথা চেপে গেলেই ভাল হতো।

হাঁ সর্দার, এ ব্যাপারে নূরীকে না জানানোই ভাল ছিলো।

যাক, যা জেনেছে তা রোধ করা যাবে না। কিন্তু কবে কখন আমরা কিভাবে রওয়ানা দেবো সে যেন একটুও টের না পায়।

সাবধানতার কোনো ত্রুটি হবে না সর্দার, কিন্তু......

বলো থামলে কেন?

সেই দুর্গম স্থানে যাচ্ছেন অথচ তাকে না জানিয়ে......

যদি ফিরে আর না আসি, এইতো?

ঠিক বলা যায় না সর্দার, কারণ নাগরাণীর দেশ সেই কোরা পর্বত। সাপের রাজ্যে গিয়ে ফিরে আসা......

বড়ই দুষ্কর, তাই না?

হাঁ সর্দার।

মানুষ মরণশীল, কাজেই মরতে একদিন হবেই। যদি মরতে একদিন হবেই, এতে ভয় পাবার কি আছে রহমান। তবে যতদূর ধারণা আমরা জয়ী হবো। আচ্ছা বলো, 'জবরু'তে গিয়ে দেখা যাক।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে আসে বাইরে। তাজ আর দুলকি পাশাপাশি ছিলো। বনহুর আর রহমান চেপে বসলো, তারপর বেরিয়ে গেলো আস্তানা থেকে।

❑

বনহুর আর রহমান ফিরে এলো একসময়। বনহুরের চোখে মুখে খুশির ভাব ছড়িয়ে আছে। রহমানের প্রস্তুতি তাকে সন্তুষ্ট করেছে। প্রফুল্ল চিত্তে

বনহুর এগিয়ে যায়। আস্তানার ভিতরে রহমান কোনো কাজে অন্য দিকে চলে যায়।

বনহুর নিজ কক্ষে প্রবেশ করে ড্রেস পাল্টে ফেললো। বড় আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজকে একবার দেখে নেয়। জমকালো ড্রেস পরে মাথায় পাগড়ীটা তুলে আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢেকে ফেলে। বেরিয়ে যায় আলগোছে। ভয় নূরীকে, সে যদি টের পায় হয়তো প্রশ্ন করে বসবে কোথায় যাচ্ছে সে।

বনহুর আস্তানার দক্ষিণ দিক ধরে বন্দীশালার দিকে এগোয়। আশেপাশে কেউ নেই। ওদিকের নির্জন স্থানে ভিন্ন একটি বন্দীশালা আছে যেখানে গুপ্তচরদের বন্দী করে রাখা হয়, সেই বন্দীশালার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

বন্দীশালার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সেদিনের গুপ্তচর সন্দেহে আটক করে রাখা বন্দী যুবকটি। যদিও তার চোখে নিদ্রার আমেজ জড়িয়ে ছিলো তবু সে সোজা উঠে দাঁড়ায়ে অভিবাদন জানালো বন্দীশালার আধো অন্ধকারে।

বনহুর বন্দী যুবকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে একটু হাসলো। তারপর বললো—অপরাধ ক্ষমা করো মাংতু। আমার অনুচরদের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এবার বন্দী যুবক কথা না বলে পারে না, বললো—আমি ইচ্ছা করেই তোমার অনুচরদের হাতে নিজকে সমর্পণ করেছি। ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বনহুর বললো—তাই নাকি?

হাঁ, নাহলে সাধ্য কি তোমার অনুচরদের?

কারণ?

তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে।

মাংতু, তুমি কেন আমার জন্য এত করো?

মাংতু নয়—আশা। তুমি আমায় আশা বলেই ডাকবে।

বলো কি কথা আশা?

বসো। তোমার কোনো অনুচর এদিকে আসবে না তো?

না, আমার আস্তানার বন্দীশালায় পাহারারত কেউ এদিকে নেই। বনহুর একটা উঁচু স্থানে বসে পড়লো, মুখের অর্ধাবৃত আবরণ খুলে ফেললো সে।

বন্দী যুবক—বেশী আশা ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো বন্দীশালার পাথুরে দেওয়ালে।

বনহুর বন্দীশালার অর্ধোজ্জ্বল আলোতে তাকিয়ে দেখলো আশার ডাগর ডাগর চোখ দুটি যেন জ্বলছে। গোলাপী গণ্ডদ্বয় আরও রক্তাভ মনে হচ্ছিলো। ওদিকের দেয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি যেন ভাবলো আশা, তারপর বললো—বনহুর, তুমি প্রশ্ন করেছিলে কেন আমি তোমার জন্য এত করি। একদিনই বলেছি, এর জবাব পাবে তুমি তোমার মনের কাছে, কাজেই তুমি এ প্রশ্ন আর কোনোদিন আমাকে করবে না। এ কথা মনে রেখো, তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি।

বলো তারপর?

জানি তুমি দস্যুসম্রাট। তোমার অসাধ্য কিছু নেই কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা তোমার অসাধ্য।

না, আমি বিশ্বাস করি না এ কথা। আমি জানি, এমন কোনো কাজ নেই যা দস্যু বনহুরের কাছে কষ্টকর।

বনহুর, তুমি যে কাজে চলছো সে কাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যদিও আমার ইচ্ছা নীলপাথর তোমাকে নিতেই হবে তবু কেন যেন ভয় হয়......

হাঃ হাঃ হাঃ, ভয়...দস্যু বনহুর ভয় বলে কিছু জানে না।

সে কথা আমার অজানা নয়।

তবে কেন ভয় হয় তোমার?

তুমি তো জানো, হিমসাগর পাড়ি দিয়ে বন্ধ্যা জঙ্গল, তারপর কোরা পর্বত?

হাঁ জানি।

হিমসাগর সে এক ভয়ঙ্কর সাগর। বরফের রাজ্য বলা চলে। এ সাগরে মাঝে মাঝে এমন একটা হাওয়া সৃষ্টি হয় যে হাওয়ায় মানুষ বা জীবজন্তুর দেহের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়।

তারপর?

হিমসাগর পাড়ি দেবার পর বন্ধ্যা জঙ্গল, সেখানে রয়েছে এক ধরনের রক্তপায়ী বাদুড়। ঐ বাদুড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বড়ই মুস্কিল। বন্ধ্যা জঙ্গলে এই রক্তপায়ী বাদুড়ের কবলে পড়ে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। তারপর কোরা পর্বতে পৌঁছলে সে এক সাজের রাজ্য। নানারকম বিষধর সাপ এ পর্বতে গিজগিজ করছে।

তাহলে তুমি কি আমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করছো আশা?

না।

তাহলে এসব কথা বলছো কেন?

এ সবকে তোমার জয় করতে হবে। নীলপাথর তোমাকে নিতেই হবে বনহুর।

এসব কথাই কি তোমার জরুরি কথা আশা? বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আশার মুখে।

আশা এবার বসে পড়ে বনহুরের পাশে একটু ফাঁক রেখে।

নির্জন বন্দীশালায় বনহুর আর আশা। যদিও এরা দু'জন একজন পুরুষ নারী তবু হঠাৎ করে কেউ দেখে ভাবতেও পারবে না এরা দু'জন পৃথক মানুষ। সবাই মনে করবে উভয়েই পুরুষ।

আশা বলে এবার—না, এ কথা বলবার জন্য আমি বন্দীশালায় ইচ্ছাপূর্বক আসিনি বনহুর। যা বলতে এসেছি তা এবার বলছি শোনো।

বলো?

যে নীলপাথরের আশায় তুমি কোরা পর্বতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছো সেই নীলপাথরের সন্ধান অপর এক ব্যক্তি পেয়েছে, সে ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে উঠেছে এবং তোমার যাত্রার পূর্বেই সে রওয়ানা দিয়েছে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বসেছিলো দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—কে সে ব্যক্তি? বলো কে সে?

সে মাইদী বুড়ীমার পালিত সন্তান মতিলাল। বড়ই শয়তান এই ব্যক্তি, মাইদীর কাছ থেকে আসল ম্যাপখানা চুরি করে সে নকল করে নিয়েছিলো, তারপর যখন জানতে পারলো সঙ্কেতপূর্ণ ম্যাপখানা মাইদী তোমাকে দিয়ে দিয়েছে তখন সে আর স্থির থাকতে পারলো না, যে তিন মাস তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে সেই তিন মাসে সে হিসমাগর পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ।

তারপর সে গত দু' সপ্তাহ হলো রওয়ানা হয়ে গেছে। বনহুর, তোমার মোটেই বিলম্ব করা উচিত হবে না।

আমি তৈরি। আচ্ছা এবার চলি। কাল ভোরে তোমার বিচার হবে৷

পরদিন।

দরবারকক্ষে সুউচ্চ আসনে বসে আছে বনহুর।

সম্মুখে দণ্ডায়মান রহমান, কায়েস আর খসরু।

নূরীও আজ দরবারকক্ষে উপস্থিত আছে। গুপ্তচরের বিচার কি হবে, কেমন হবে সবাই দেখবার জন্য উন্মুখ।

বনহুরের অনুচরগণ প্রায় বেশির ভাগই আজ দরবারকক্ষে হাজির আছে। সকলের হাতেই অস্ত্র।

বনহুর যখন দরবারকক্ষে বসে তার দেহে থাকে জমকালো পোশাক। কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলভার, বামপাশের খাপে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। ছোরাখানার বাটে ব্রঞ্চ দিয়ে সংকেতচিহ্ন।

সম্মুখের টেবিলে একখানা ছোরা গাঁথা, সে ছোরাখানার বাটেও ঐ একই সংকেতচিহ্ন। প্রত্যেকটা অনুচরের হাতে যে বর্শাগুলো রয়েছে সবগুলোর ফলকে ঐ চিহ্ন।

দরবারকক্ষ জমাট অন্ধকার, তাই দিনের বেলা হলেও দরবার কক্ষের দেয়ালে মশাল জ্বলছে।

মশালের আলোতে বনহুরের চোখ দু'টো জ্বলছে যেন।

হাত দু'খকানা পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দরবারকক্ষে নিয়ে আসা হলো গুপ্তচর বেশি বন্দী আশাকে। বনহুরের সামনে মেঝেতে দাঁড় করানো হলো তাকে।

আশা একবার শুধু তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুরকে তারপর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলো বিপরীত দিকে।

বনহুর গম্ভীর নিশ্চুপ।

রহমান এবং অন্যান্য সকলের মুখেই একটা গভীর উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান। নূরী বনহুরের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখেমুখেও একটা উদ্বিগ্নতা। সবাই জানে, বনহুর গুপ্তচরকে নিজ হাতে সাজা দিয়ে থাকে।

গুপ্তচর যুবকটির প্রতি নূরীর মনে একটা সহানুভূতি জাগছিলো—বেচারা ছেলেমানুষ, কেন সে আস্তানায় প্রবেশ করেছিলো? জানে না সে কার আস্তানায় প্রবেশ করেছে? কিন্তু কোনো কথা বলতে সাহসী হচ্ছিলো না নূরী।

দরবারকক্ষ নীরব।

দেয়ালে মশালের আলো দপদপ করে জ্বলছে।

মশালের আলোতে দস্যু বনহুরকে আজ অত্যন্ত স্থির, গম্ভীর মনে হচ্ছে।

সর্দারের আদেশের প্রতীক্ষায় আছে বনহুরের অনুচরগণ, আদেশ পেলেই গুপ্তচরকে তারা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে।

বনহুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো—আজকের বিচার ভার আমি আমার সহধর্মিনী নূরীর উপর ছেড়ে দিলাম। সে যেভাবে এই যুবককে হত্যা করতে চায় সেইভাবে একে হত্যা করা হবে। নূরীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো—এসো নূরী।

বনহুরের কথায় দরবারকক্ষের সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। নূরীও কম অবাক হয়নি, আজ হঠাৎ একি পরিবর্তন সর্দারের মধ্যে! বনহুর কোনোদিন গুপ্তচরকে ক্ষমা করে না।

নূরী বনহুরের আসনের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো। মনে মনে সে ভীষণ খুশি হয়ে উঠেছে।

রহমান শুধু বিস্মিতই হয়নি, স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। হঠাৎ সর্দার একি করছেন ভেবে পায় না, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নূরী যখন আসনের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন বনহুর সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

নূরী একবার দরবারকক্ষের মধ্যে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকালো বন্দী যুবকের দিকে, তারপর বললো—আমি জানি গুপ্তচরের শাস্তি প্রাণদণ্ড; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না এ দণ্ড সকলের জন্য প্রাপ্য। আমি একে মুক্তি দিলাম।

একসঙ্গে সবাই তাকালো সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুরের মুখে আনন্দপূর্ণ একটা ভাব ফুটে উঠেছে। সে এবার রহমানকে আদেশ দিলো—রহমান, যাও ওর বন্ধন খুলে দাও।

সর্দারের আদেশ পালন না করে পারে না রহমান।

যুবকটির বন্ধন মুক্ত করে দেয় সে।

বনহুর আসনের পাশ থেকে নেমে আসে যুবকের পাশে, বলে—এসো যুবক, তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

দরবারকক্ষের সবাই অবাক হয়, এমন কি নূরীও হতবাক হয়ে যায়, সে মুক্তি ঘোষণা করলেও বনহুর যে এত সহজে তা মেনে নেবে, ভাবতে পারেনি সে। ভেবেছিলো তাকে এ ব্যাপার নিয়ে বনহুরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে। কিন্তু সে এই মুহূর্তে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যায়, বনহুর নিজে বন্দীকে আস্তানার বাইরে পৌঁছে দেবে, যেন কল্পনার বাইরে।

বনহুর বন্দী যুবকসহ দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

আর একবার দরবারকক্ষের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

পাশাপাশি দুটি অশ্বে বনহুর আর আশা এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখান সরু পথ ধরে ছুটছে তারা। বনহুরের অশ্বের সঙ্গে তাল রেখে ছুটছে আশার অশ্ব। আশার দেহে এখনও সেই যুবকের পোষাক।

অনেক দূর এসে হঠাৎ থেমে পড়লো আশা, বনহুরও তার অশ্ব তাজকে থামিয়ে ফেললো।

আশা তার অশ্ব থেকে নেমে পড়লো।

বনহুরও নেমে দাঁড়ালো তার অশ্ব থেকে।

আশা বললো—আর এগিয়ে দিতে হবে না, এবার বিদায় দাও।

আশা, আবার কবে তোমার সাক্ষাৎলাভ ঘটবে?

তুমি যখন প্রয়োজন মনে করবে।

আমি চাই নীল পাথর সংগ্রহে তুমি আমার পাশে থাকবে।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। চলি এবার তাহলে?

বনহুর নীরবে মাথাটা একটু কাৎ করে সম্মতি জানালো।

আশা তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে আর একবার তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর নীরবে হাত নাড়লো।

আশার অশ্ব ছুটতে শুরু করলেই বনহুর চেপে বসলো তার অশ্বপৃষ্ঠে।

❑

বনহুর বিশ্রামকক্ষে অর্ধশায়িত অবস্থায় শায়িত। সম্মুখে গোলটেবিলে স্তূপাকার আংগুল ও নানারকম ফলমূল।

বনহুর বাম হাতে আংগুরের ঝোপ তুলে মুখে দিচ্ছে। তাকে অত্যন্ত শান্ত, স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। চুলগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে আছে কপালের চারপাশে। সম্মুখে টেবিলে ফলের রেকাবির পাশে তার রিভলভারখানা পড়ে আছে।

রহমান দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের পাশে। সর্দার কিছু বলবে, সেজন্য অপেক্ষা করছে। অবশ্য তাকে আজ বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে।

বনহুর আংগুরের ঝোপ থেকে কয়েকটা আংগুর দাঁত দিয়ে ছিড়ে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো—রহমান, আজ রাতে হিমসাগর পাড়ি দেবার জন্য রওয়ানা দেবো।

সব প্রস্তুত সর্দার।

একটা কাজ এখনও বাকি আছে রহমান।

বলুন?

কান্দাই কমিশানারের কাছে যে দু'লাখ টাকা পেয়েছি, ঐ টাকা আপাততঃ আমাদের কোনো প্রয়োজনে আসছে না। ঐ টাকা মথুয়া দ্বীপের জনগণের মধ্যে বিতরণ করে এসো।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার।

শোনো মথুয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ঐ অর্থ পায়, কারণ আমি জানি মথুয়া দ্বীপবাসী অত্যন্ত দরিদ্র।

আপনার আদেশ ঠিকভাবে পালন করবো।

যাও, বিলম্ব করো না। এই নাও চাবি......টাকা বের করে নিয়ে যাও।

বনহুর পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে রহমানের হাতে দিলো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

বনহুর এবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, পাশের ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে ড্রেস পাল্টো নিয়ে বড় আয়নাখানার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

এখন বনহুরের শরীরে দস্যু-ড্রেস নেই।

তার শরীরে এখন মূল্যবান স্যুট। তাকে দেখলে বড় একজন অফিসার বলে মনে হচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে অগ্নিসংযোগ করে ফিরে দাঁড়াতেই নূরী পথরোধ করে দাঁড়ায়—কোথায় যাচ্ছো?

এ সময় নূরীকে দেখে চমকে উঠে বনহুর। মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে বলে—একটু বাইরে যাবো।

উঁহু চলবে না।

লক্ষ্মীটি........

না, কোনো কথাই শুনবো না। বনহুরের টাই ধরে ঝাঁকুনি দেয় নূরী।

না গেলেই নয়, শহরে যেতে হবে।

এই তো এলে, আবার যাবে—তোমার কি কোনো সময় বিশ্রাম নেই?

বিশ্রাম! হাসালে নূরী! আজ নতুন করে আবার শুনলাম তোমার মুখে এক কথা।

আমি জানি তুমি কোথায় যাচ্ছো।

জানো বলেই বলিনি। তোমার মতই সেও যে আমার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে। লক্ষ্মীটি, আমাকে যেতে দাও। আজই ফিরে আসবো।

কেন যাবে সেখানে তাও জানি হুর, আমার কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারবে না।

এবার বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, তারপর বলে—বলো কেন?

মনিরা আপার কাছে বিদায় নিতে।

সঠিক বলতে পারলে না।

নূরের কাছে......

উহুঁ মায়ের আশীর্বাদ......

হুর, তুমি সত্যি সেই মৃত্যু গহ্বরে যাবে? সেই কোরা......

নূরী, তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছো। দেখবে ঠিক নীলপাথর নিয়ে ফিরে আসবো।

আমার ভয় হচ্ছে, শুনেছি কোরা পর্বত সাপের রাজ্য। সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।

তুমি যা শুনেছো সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া তুমি তো জানো অসাধ্য সাধন করাই তোমার বন্ধুর কাজ।

হুর!

হাঁ নূরী, বিশেষ করে তুমি কোনো কাজে আমায় বাধা দেবে না। বলো দেবে না......

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—খোদা তোমার সহায় হোক।

নূরীর চিবুক উঁচু করে ধরে বনহুর, তারপর গভীর একটু চুম্বন রেখে দিয়ে বেরিয়ে যায় দ্রুত পদক্ষেপে।

তাজ প্রস্তুত ছিলো, বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসে।

কান্দাই জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ে তাজ।

অদূরেই গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে গাড়িতে চেপে বসে। গাড়িখানা এবার বনহুরের হাতে উল্কাবেগে চলতে থাকে।

চৌধুরীবাড়ি পৌঁছতে বেশি বিলম্ব হয় না, গাড়ি বারান্দায় গাড়ি রাখতেই সরকার সাহেব এগিয়ে এলেন। বনহুরকে দেখে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। এগিয়ে নিলেন আদরভরা সম্ভাষণ জানিয়ে।

অদূরেই সাইকেল চালাচ্ছিলো নূর, সে পিতাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে সাইকেল রেখে—আব্বু এসেছো?

এসো আব্বু......বনহুর নূরের হাত ধরে টেনে নেয় কাছে। তারপর ওকে নিয়ে এগিয়ে চলে অন্তপুরের দিকে।

বনহুর জানতো, পুলিশ সর্বক্ষণ তার বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকে, তবু সে কৌশলে প্রায়ই আসতো। আজও তেমনি এসেছে। আসলে বনহুরের আসল চেহারা পুলিশ মহলের অনেকের কাছেই অজ্ঞ কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার ছাড়া।

আজও ঘনহুরের গাড়ি যখন চৌধুরী বাড়ির গেটে প্রবেশ করলো তখন কয়েকজন পাহারারত পুলিশ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো কারণ মনিরার অসুস্থ কালে বনহুর ডাক্তারের বেশে এ গাড়িখানাই ব্যবহার করতো।

বনহুরকে পেয়ে নূর আনন্দে আত্মাহারা, সে ছুটলো দাদী আম্মাকে সংবাদ দিতে।

বনহুর সেই ফাঁকে প্রবেশ করলো মনিরার কক্ষে।

পা টিপে অতি সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে তাকালো বনহুর চারদিকে।

মনিরা আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখছিলো।

পিছন থেকে বনহুর এসে মনিরার চোখ দুটো ধরে ফেলে।

চমকে উঠে মনিরা। পরক্ষণে হাতের উপর হাত রেখে বুঝতে পারে সে এ হাত দু'খানা কার। বলে মনিরা—ছিঃ কেউ দেখে ফেলবে, ছাড়ো!

মনিরা, কেমন আছো?

খুব ভাল। গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে মনিরা।

বনহুর হেসে বলে—তাতো তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। আবার তোমার চেহারাটা এমন হয়েছে কেন বলো তো? নিশ্চয়ই কোনো অসুখ বিসুখ......

এমন সময় নূর আর মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে। পুত্রের কথাটা তার কানে যায়, বলেন তিনি—অসুখ করবে না, যত বলি শরীরের দিকে

লক্ষ্য দাও মা, শরীরের দিকে লক্ষ্য দাও—কিন্তু মোটেই শরীরের যত্ন নেবে না।

বনহুর এগিয়ে আসে মায়ের দিকে—মা, ভাল আছো?

আছি বাবা। তুই কেমন ছিলি রে?

ভালই আছি মা, তবে তোমাদের ছেড়ে মোটেই ভাল থাকি না। কথার ফাঁকে নূরকে টেনে নেয় বনহুর কোলের কাছে, আদর করে ছোট্ট একটা চুমু দেয় তার গালে, তারপর বলে—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে আব্বু?

ভাল। জানো আব্বু, আমি এবার ক্লাশে ফাষ্ট হয়েছি।

আনন্দধ্বনি করে উঠে বনহুর—সাবাস! নূরকে আরও নিবিড়ভাবে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে—বলো তো আব্বু কি নেবে?

হাসেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা আনন্দদীপ্ত নয়নে তাকিয়ে আছে স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে।

নূর হঠাৎ বলে উঠে—পিস্তল!

পিস্তল! পিস্তল নিয়ে কি করবে? বললো বনহুর।

নূর দক্ষিণ হস্তে আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—পিস্তল নিয়ে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবো।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হলো কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, পর মুহূর্তেই সে হেসে উঠলো—চমৎকার, নিশ্চয়ই দেবো।

নূরের কথা শুনে মনিরা এবং মরিয়ম বেগমের মুখ কালো হয়ে উঠলো। মরিয়ম বেগম তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললেন—নূর, পিস্তল নিতে নেই, তুমি তো ছোট্ট ছেলে।

নূর পা উঁচু করে বললো—কই, আমি তো এখন আর ছোট্ট নেই। এই দেখো এখন আব্বুর বুক অবধি হয়েছি।

মনিরা এতক্ষণ রাগে ফুলছিলো, নূর ছোট হলে চড় বসিয়ে দিতো সে তার গালে। গম্ভীর গলায় বললো সে—নূর, সরে এসো এদিকে, আব্বুকে বিরক্ত করো না।

বনহুর বললো—ওরা যে যাই বলুক, আমি তোমাকে পিস্তল এনে দেবো।

মনিরা রাগতভাবে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

এমন সময় এক ঝি এসে জানালো—আম্মু, আপামনি আপনাকে ডাকছেন।

আসছি। বলে বেরিয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর এবার নূরসহ খাটে বিছানার পাশে এসে বসলো।

নূর বললো—আব্বু জানো আমি বড় হয়ে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করবো। কেউ নাকি দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে পারে না।

হাঁ কেউ পারে না, তুমি পারবে।

আব্বু, আম্মী কিন্তু আমাকে বকে, বলে, দস্যু বনহুর তোর কি অন্যায় করেছে তাই তাকে পাকড়াও করবি? আরও বলে কি জানো আব্বু? আম্মী বলে, দস্যু বনহুর খুব ভাল, সে কোনোদিন কারো অন্যায় করে না। সব আম্মীর মিথ্যা কথা, তাই না আব্বু?

না, তোমার আম্মী মিথ্যা বলেন না নূর। তিনি যা বলেন সব সত্য।

দস্যু বনহুর ভাল লোক?

তা জানি না, তবে আমার মত।

তোমার মত?

হাঁ আব্বু।

না না, সে কখনও তোমার মত হতে পারে না। তোমার মত এত সুন্দর হলে সে কোনোদিন পরের ধন লুটে নিতো না, হত্যা করতো না এত মানুষকে। তুমি না বলেছিলে দস্যু বনহুর খুব কুৎসিত দেখতে—হেইয়া মাথা এমনি বড় বড় চোখ, মস্তমস্ত দাঁত......

এমন সময় মনিরা প্রবেশ করে কক্ষমধ্যে, হাতে তার খাবারের প্লেট।

মাকে দেখে নূর চুপ করে যায়।

মনিরার হাতে নাস্তা খাবার পর আসে মায়ের হাতে খাবারের পালা।

মরিয়ম বেগম পুত্রকে আজ পাশে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। এটা খাও বাবা, ওটা খাও বাবা বলে একরাশ খাবার নিয়ে বসেছেন তিনি।

বনহুরের প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য ফলমূল হলেও আজ মায়ের হাতে পোলাও, কোরমা, মাছ, ভাজি, এটা সেটা প্রচুর খেয়ে ফেললো। ছোটবেলা থেকে বনহুরের এসব খাওয়ার তেমন অভ্যাস নেই, তবু সে মায়ের কাছে বসে খেতে খেতে না করতে পারছে না।

অনেক খেয়েছি মা আর নয়, বলে বনহুর এবার হাত গুটিয়ে বসলো।

মরিয়ম বেগম এবার পায়েসের থালাটা পুত্রের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বলেন—নে বাবা, আর একটু খা।

সর্বনাশ, আর একটুও পারবো না।

নারকেল দুধের পায়েস, মনিরা অনেক সখ করে রেঁধেছে, একটু মুখে দে বাবা।

বনহুর এবার মনিরার দিকে তাকিয়ে দেখলো, মনিরার ইচ্ছা সে পায়েসটা খায়। বনহুরের উপায় না থাকলেও পায়েসের থালাটা টেনে নিয়ে খেতে লাগলো।

মনিরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

❑

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলো বনহুর আস্তানায়।

এখন বনহুরকে অত্যন্ত গম্ভীর মনে হচ্ছে। নিজকে সে শক্ত করে নিয়েছে, নূরী বনহুরের সম্মুখে সহসা গিয়ে কিছু বলবে তার সাহস পাচ্ছিলো না।

সমস্ত আস্তানায় একটা গাম্ভীর্য বিরাজ করছে।

বনহুরের সমস্ত অনুচরদের মধ্যে আয়োজন চলেছে। হিমসাগর পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কিছুসংখ্যক অনুচর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেওয়া হচ্ছে।

নূরী কিন্তু খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তার মনে শান্তি নেই, একটা অজানা আশঙ্কা তার হৃদয়কে বিদীর্ন করে দিচ্ছিলো। মাকে চিন্তিত দেখে জাভেদও কেমন মনমরা হয়ে পড়েছে। ওর মুখেও হাসি নেই।

বনহুর তার কাজ শেষ করে নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে। ওর কাছে বিদায় নেওয়া এখনও হয়নি।

একটু আগে দরবারকক্ষে তার সমস্ত অনুচরদের ডেকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে কে কি কাজ করবে, কে কিভাবে চলবে, সব জানিয়ে দিয়েছে বনহুর। সবার কাছে বিদায় নিয়েছে সে এমন কি বৃদ্ধা দাইমা ও নাসরিনের কাছেও।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই নূরী অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, বারবার তার চোখ ছাপিয়ে পানি বেরিয়ে আসছিলো।

বনহুর এসে দাঁড়ালো নূরীর পাশে, ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলো— নূরী!

না, তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

কেন?

যাবে যাও। এত লোভ তোমার! কোটি কোটি অর্থ সম্পদ তোমার ধনভাণ্ডারে রয়েছে অথচ তোমার নীল পাথর না হলে কি চলতো না?

কে বললো আমার ধনভাণ্ডারের ধন-সম্পদ আমার? ওগুলো আমার ধনভাণ্ডারে রেখেছি মজুত করে কিন্তু ওর একটি কণাও আমার নয়।

তবে কার?

এই বিদায় মুহূর্তে আমায় হাসালে নূরী। ওসব যতকিছু রয়েছে আমার ধনভাণ্ডারে সব দেশের দুঃস্থ অসহায় অনাথদের জন্য। যারা খেতে না পেয়ে অনাহারে দিন কাটায়, যারা পরতে না পেরে উলঙ্গ থাকে তাদের জন্য আমি মজুত রেখেছি ওসব। প্রয়োজনমত আমার অনুচরগণ গিয়ে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আসে। ওসব আমি সঞ্চয় করেছি সত্য কিন্তু আমার ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। যাক্, সে কথা তোমাকে আজ নতুন করে বোঝাতে চেষ্টা করবো না। নূরী, নীল পাথর নিয়ে ফিরে আসবো এবং সেই নীল পাথর দিয়ে তোমার মাথার মুকুট গড়িয়ে দেবো। হাসিমুখে বিদায় দাও নূরী, বলো তুমি খুশি মনে বিদায় দিচ্ছো? বলো?

এবার নূরী চোখে অশ্রু আর মুখে হাসি নিয়ে বললো—যাও।

বেশ। কিন্তু জাভেদ কই?

ও ঘুমোচ্ছে।

বনহুর দোলনার দিকে এগিয়ে গেলো, ঘুমন্ত জাভেদের মুখে উবু হয়ে চুমু দিলো সে গভীর স্নেহে, তারপর নূরীর চিবুকটা উঁচু করে একটু চাপ দিয়ে বললো—চলি, খোদা হাফেজ!

বনহুর বেরিয়ে যায়। নূরী ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

পশমের মোটা ওভারকোট গায়ে, মাথায় ক্যাপ। ঠোঁটের ফাঁকে মোটা চুরুট, জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর।

হিমসাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজ এখন চলেছে। সেকি ভীষণ ঠান্ডা, হাত-পা জমে বরফ হবার যোগাড়। জাহাজে বনহুরের যেসব অনুচর কাজ করছে তারা সবাই মোটা পশমী পোষাকে শরীর আচ্ছাদিত রেখে কাজ করে চলেছে। জাহাজখানা খুব স্পীডে এগুতে পারছে না, কারণ হিমসাগরে মাঝে মাঝে বিরাট বরফের চাপ ভেসে আসছে, হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেলে আর রক্ষা নেই, জাহাজটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দস্যু বনহুরের এ জাহাজখানা ছিলো অদ্ভুত ধরনের। দেখতে ঠিক একটা কচ্ছপের মত। সম্মুখের সার্চলাইট একটি নয়, কচ্ছপের চোখের মত দু'পাশে দুটো। কচ্ছপের মাথার মত সামনের দিকটা।

বহুদূর থেকে মনে হয় ওটা জাহাজ নয় কচ্ছপ। নিচের কিছু অংশ পানির মধ্যে তলিয়ে থাকে, মাঝে কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ ডুবে যায়, তখন শুধু কচ্ছপের মাথাটা জেগে থাকে পানির বুকে।

ইচ্ছা করলে জাহাজখানা খুব স্পীডে চলতে পারে, আবার খুব ধীরেও পারে। অন্যান্য জাহাজ চলাকালে যেমন একটা ঝক্ ঝক্ শব্দ হতে থাকে, এ জাহাজে তেমন কোনো শব্দ হয় না। হুস্ হুস্ একটা শব্দ হয়, সেটা যেন কোনো অজগর সাপ বা ঐ ধরনের কোনো জীবের নিশ্বাসের শব্দ বলে মনে হয়।

বনহুর যখন কোনো দুর্গম স্থানে বা ভয়ঙ্কর কাজে জলপথে যেতো তখন এই জাহাজখানা ব্যবহার করতো। জাহাজখানা অন্যান্য জাহাজের মত বিরাট না হলেও একেবারে ছোট নয়।

এখন জাহাজখানা পানির উপর অর্ধ-ভাসমান অবস্থায় এগিয়ে চলেছে।

আজ দু' সপ্তাহ হলো বনহুর কান্দাই ত্যাগ করেছে। প্রথমে কান্দাই নদী হয়ে ঝাম নদীতে, তারপর নীল নদের কিছু পথ পেরিয়ে হিমসাগরে।

হিমসাগরে জাহাজ আসার পর জাহাজের গতি কমিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। কারণ বরফের চাপ স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে ভেসে যাচ্ছে, কাজেই জাহাজখানাকে সাবধানে এগুতে হচ্ছে।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, সূর্যের আলোতে সাগরের বুকে বরফের চাপগুলো অদ্ভুত চক্ চক্ করছিলো। কখনও বা নীল-লাল-হলদে রংধনুর মত রং ছড়াচ্ছিলো। বনহুরের হিমসাগরে এই প্রথম পদক্ষেপ। বহুদিন বনহুর হিমসাগরের বহু গল্প শুনেছে, আজগুবি বলে মনে হয়েছে তার। আজ বনহুর নিজের চোখে দেখছে এবং অনুভব করছে। এখনও আজগুবি কিছু দৃষ্টি গোচর হয় নি তবে আশঙ্কা রয়েছে অনেক।

বনহুর বিস্মিত দৃষ্টি মেলে হিমসাগরের বুকে বরফ চাপের ছুটো ছুটি দেখছিলো। মাঝে মাঝে চুরুট থেকে ধুয়া নির্গত হচ্ছিলো, সেই ধুয়ারাশির মধ্যে দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসছিলো।

হিমসাগরের জমাট ঠান্ডায় বনহুরের দু'জন অনুচর পঙ্গু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বনহুর তাই কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। হিমসাগরে হিম পড়ে আসছে আরও বেশি রকম।

বনহুর যখন এসব নিয়ে চিন্তা করছে তখন তার পেছনে এসে দাঁড়ায় রহমান।

বনহুরকে লক্ষ্য করে রহমান বলে—সর্দার!

বনহুর ফিরে তাকালো—বলো?

সর্দার আমরা যে নতুন একজন সারেঙ্গকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিয়েছি তার আচরণ সন্দেহজনক।

রবিলালের কথা বলছো?

হাঁ সর্দার।

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো, বললো সে—রহমান একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয়নি। শুনে রাখো, রবিলাল আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সে পুরুষ নয়—নারী......

রবিলাল নারী?

হাঁ।

রহমানের চোখেমুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর চুরুট থেকে একমুখ ধোঁয়া নির্গত করে ধীর কণ্ঠে বললো—রবিলাল নীল-পাথর সংগ্রহে আমাদের সাহায্য করবে, কারণ সে হিমসাগরের পথ চেনে। রবিলালের আসল পরিচয়—সে আশা।

আশা!

হাঁ রহমান।

এবার রহমানের মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। এই ক'দিন সে ওকে সন্দেহ করে এসেছে, কারণ তার আচরণ ছিলো সন্দেহজনক। সব সময় নিজকে রবিলাল সবার দৃষ্টি আড়ালে সরিয়ে রাখতো।

বনহুর আর রহমান যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে জাহাজের পেছন ডেকের দিকে।

মুহূর্তে জাহাজে বিপদসংকেত ঘন্টা বেজে উঠে।

রহমান আর বনহুর ছুটলো পেছন ডেকের দিকে, যেদিক থেকে আর্তচিৎকারটা এসেছিলো।

বনহুর আর রহমান পৌঁছতেই দেখলো, একটা অদ্ভুত ধরনের জীব উঠে এসেছে তাদের জাহাজে পেছন দিক দিয়ে। হিমসাগর থেকে জীবটা উঠে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিরাট আকার, কতকটা কুমীরের মত দেখতে, শরীরে বড় বড় কাঁটার মত শক্ত কি জিনিস রয়েছে। পেছন ডেক থেকে একজন অনুচরকে ধরে মুখগহ্বরে পুরেছে। লোকটার শরীরের কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এখনও। জীবটার মুখের দু'পাশ বেয়ে তাজা লাল টক্ টকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়ে জীবটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রহমানও গুলি ছুঁড়লো কিন্তু আশ্চর্য, গুলি খেয়েও জীবটা ঠিক পূর্বের মত চার পায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তার মুখ থেকে তাজা রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

সমস্ত জাহাজে একটা মহা হট্টগোল শুরু হয়।

গুলির পর গুলি চালায় বনহুর আর রহমান।

ওদিক থেকে জীবটার ঠিক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রবিলাল বেশি আশা মেশিনগান ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। আশ্চর্য, তবু জীবটার কিছু হচ্ছে না, সে হা করে বারবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাচ্ছে। গোলাকার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

জীবটা যখন যেদিকে এগুচ্ছে তখন সেইদিকে জাহাজখানা এলিয়ে পড়ছে। জাহাজের চালক জাহাজটাকে ঠিক রাখতে পারছে না বলে সাউন্ড বক্সে ঘোষণা করছে।

বনহুর, রহমান এবং তার অন্যান্য অনুচর মরিয়া হয়ে গুলি চালাচ্ছে।

এই তীব্র শীতের মধ্যেও এক একজন ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

গুলির পর গুলি খেয়ে জীবটা সাংঘাতিক ঘায়েল না হলেও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, তাতে কোনো ভুল নেই।

হঠাৎ জীবটা পেছন ফিরে আশাকে আক্রমণ করলো—আচম্‌কা আশার দিকে লেজ দিয়ে প্রচন্ড একটা আঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে আশার হাতের মেশিনগান দূরে ছিটকে পড়লো, আশা পড়ে গেলো হিমসাগরের মধ্যে।

সেইক্ষণে জীবটাও গড়িয়ে নেমে গেলো সাগরের জলে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে শরীর থেকে ওভারকোট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হিমসাগরে যেখানে পড়ে গিয়েছে আশা।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর সবাই হায় হায় করে উঠলো।

রহমান ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো রেলিংয়ের ধারে।

জীবটা তখন সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে।

আশাকেও ঠিক দেখা যাচ্ছে না।

বনহুর হিমসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহ জমে বরফ হবার উপক্রম হলো। চারদিকে তাকালো আশার উদ্দেশ্যে। কয়েকটা বরফের চাপ ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না।

ওদিকে রহমান জাহাজ থামিয়ে ফেলার আদেশ দিয়ে সাগরের বুকে বোট নামানো শুরু করে দিলো। একটি নয়, কয়েকটা বোট নামানো হলো অল্পক্ষণের মধ্যে।

বনহুর হিমসাগরে সাঁতার কেটে আশার অন্বেষণ করে ফিরছে। এমন একটা বিপদ এত শীগ্‌গীর এসে পড়বে, কেউ ভাবতে পারেনি। বনহুরের অনুচরদের মুখে হতাশা আর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে। সবাই জাহাজময় ছুটোছুটি করছে, কিভাবে তারা সর্দারকে ফিরে পাবে সেই চেষ্টা চালাচ্ছে।

বনহুরের হাত পা জমে আসছে, আর বুঝি সে সাঁতার কাটতে পারবে না। দৃষ্টি তার আশার সন্ধানে এদিক ওদিক ফিরছে। এদিকে আবার বরফের চাপ দু'পাশ থেকে তাকে পিষে ফেলার জোগাড়, অতি কষ্টে চাপগুলো এড়িয়ে সাঁতার কাটছে সে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি পড়ে আশার ঝাকড়া চুলের উপর। তলিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে ঢেউয়ের আঘাতে।

বনহুর অতিকষ্টে সাঁতার কেটে আশার পাশে যেতে চেষ্টা করলো। এদিকে একটা আশঙ্কা মনে জাগছে, জীবটা যদি তাদের দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষা নেই।

একসময় বনহুর আশাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হলো। ঠান্ডায় হাত দু'খানা যদিও অবশ হয়ে আসছিলো তবু সে প্রাণপণে হাত দু'টিকে শক্ত করে রাখলো।

বনহুর আশাকে ধরে ফেলতেই বুঝতে পারলো আশা সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যত সাহসী আর শক্তিশালিনীই হোক না কেন, আশা তো মেয়েছেলে, কাজেই হিমসাগরের জমাট ঠান্ডা সে সহ্য করতে পারেনি।

বনহুর আশাকে নিয়ে সাঁতরে একটা বরফের চাপের পাশ কেটে এগুচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা বরফের চাপ বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসে—আর এক দন্ড, তাহলে পিষে যাবে ওরা দু'জন। বনহুর আশাকে অতিকষ্টে বরফের চাপটার উপর তাড়াতাড়ি তুলে দেয়, পরে

নিজেও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে বসে চাপটার উপরে। বরফের চাপটা কিন্তু সাঁ সাঁ করে জাহাজখানার বিপরীতে ভেসে যাচ্ছিলো।

রহমান এবং বনহুরের অনুচরগণ জাহাজ থেকে নানা রকম উদ্ধার চেষ্টা চালিয়েও কিছু করতে সক্ষম হলো না। বরফের চাপসহ বনহুর আর আশা দ্রুত তাদের জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই চিৎকার করে উঠলো—সর্দার একি হলো.......

রহমান তো ধপ্ করে বসে পড়লো জাহাজের ডেকের উপর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো বনহুর আর আশাকে নিয়ে বরফের চাপটা।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো তাদের জাহাজখানা দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছে। এমন বিপদ তাঁর জীবনে অনেক এসেছে, তবু আজ বনহুর ঘাবড়ে গেলো অসম্ভবরূপে।

কিছুক্ষণ তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেলো। এখন কি ভাবে বাঁচা যায়! কেটে যায় কিছু সময় বনহুরের চিন্তাশক্তি স্থির হয়ে আসে, ফিরে তাকায় বনহুর পাশেই বরফ চাপের উপর শায়িত আশার দিকে। এখনও আশার দেহে সেই রবিলালের পুরুষ ড্রেস রয়েছে। অজ্ঞান রয়েছে আশা। বনহুর তাকালো আশার মুখে। আশার সুন্দর রক্তাভ মুখমণ্ডল রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দু'খানা কালো হয়ে গেছে একেবারে কালীর মত।

বনহুর নিজেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, এখনও যে সে জ্ঞান হারায়নি তাই আশ্চর্য। হাত দু'খানা মেলে ধরলো চোখের সম্মুখে। হাত দু'খানা তার নিজের বলে মনে হলো না, কারণ ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয়ে উঠেছে হাত দু'খানা তার।

আশার দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক প্রাণ হীনের মতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে সে বরফের চাপটার উপরে।

সূর্যের তাপে ক্রমে বনহুরের দেহটা কিছু উষ্ণ হয়ে উঠলো, হাত-পা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এবার বনহুর এগিয়ে এলো আশার দিকে। ওর হাত দু'খানা শক্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে, বনহুর ওর হাতখানা সূর্যের তাপে মেলে দিলো দু'পাশে। মাথায় ছিলো শক্ত ধরনের ক্যাপ, ক্যাপটা কণ্ঠের নিচে দিয়ে মজবুত করে বাঁধা থাকায় চুলগুলো পাশ কেটে কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছিলো, ক্যাপটা কিন্তু তখনও আটকানো ছিলো কাঁধের একপাশে। বনহুর ওর কণ্ঠ থেকে ক্যাপের ফিতা খুলে দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যের প্রখর তাপে আশার মুখ ও হাত-পা স্বাভাবিক আকার ধারণ করছে। আশার জ্ঞান ফিরে আনার জন্য বনহুর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

একসময় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো আশা।

বনহুর খুশি হলো, কারণ এই বিপদে একজন সঙ্গী পাশে পেলে তবু কতকটা সান্ত্বনা । তাছাড়া আশাকে উদ্ধার করার জন্যই সে নিজে হিমসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। এতটুকু প্রাণের মায়া সে করেনি।

নিজের জীবন নিয়ে বেঁচেছে আর আশাকে উদ্ধার করতে পেরেছে, এটা বনহুরের মনে অনেকটা আশ্বাস যোগায়। আশা চোখ মেলতেই বনহুর ডাকলো—আশা!

আশার ফ্যাকাশে মুখেও একটা খুশির আভাস ছড়িয়ে পড়লো। বললো—আমার কি হয়েছে?

একটু সুস্থ হও সব বুঝতে পারবে।

উঠে বসতে যায় আশা।

বনহুর ওকে ধরে আবার শুইয়ে দিয়ে বলে—উঠো না, উঠো না।

বড্ড ঠান্ডা, পিঠটা আমার জমে গেছে, উঃ!

বনহুর ওকে তুলে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে গিয়ে বললো—চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো, সূর্যের তাপে দেহটা গরম হয়ে উঠলেই সুস্থ বোধ করবে।

আশার ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিলো, জীবনে তার জন্য এত দরদ বুঝি আর কেউ করেনি। অনাবিল এক আনন্দে ভরে উঠে তার মন। যে বনহুর তার স্বপ্ন-সাধনা, সেই বনহুর আজ তার এত কাছে, এ যেন আশার চরম ভাগ্য।

বনহুরের হাতের উপর হাতখানা রাখে আশা।

বনহুর ওর হাতখানাকে মুঠোর মধ্যে ধরে উষ্ণ করে তোলার চেষ্টা করে।

আশার চোখ দুটো মুঁদে আসে, তার হৃদয়ের স্পন্দন যেন বেড়ে যায়।

একসময় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে আশা।

তার শরীরের পোষাক পরিচ্ছদ শুকিয়ে যায়। চুলগুলো শুকিয়ে রেশমের মত ফুলে উঠে। আবার আশার গণ্ড রক্তাভ হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

বনহুর আর আশাকে নিয়ে বরফের চাপটা সাঁ সাঁ করে ভেসে চলেছে। বেলা অস্তমিত প্রায়, হিমসাগরের হিমেল হাওয়া কাঁপন লাগাচ্ছে তাদের শরীরে। রাত্রির অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে ক্রমান্বয়ে।

আশা বললো—ভাবতেও পারিনি আজ এমন এক অবস্থায় পড়বো। রাত আসছে আবার কোন্ বিপদ আসবে কে জানে!

এত বিপদেও বনহুরের মুখে হাসি ফুটলো, সে বললো—এরপর আবার নতুন বিপদ!

তুমি তো জানো, হিমসাগরের বরফের তলায় নানা রকম অদ্ভুত জীব বাস করে, হঠাৎ যদি কোনো রকম ভয়ঙ্কর জীবের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে আর রক্ষা নেই।

মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন মৃত্যুকে ভয় করে আর কি হবে! হিমসাগরের হিমেল হাওয়ায় কতক্ষণ আমরা বাঁচবো? শরীরের রক্ত জমে বরফ হয়ে আসবে রাত বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে।

আশা বনহুরের কণ্ঠস্বর শুনছিলো, কথাগুলো তার হৃদয় স্পর্শ করছিলো যেন। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে সে তাকিয়ে ছিলো বনহুরের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলো।

বনহুর আর আশা প্রতি মুহূর্তে যে কোনো বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো।

এমন সময় হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে পড়ে তাদের মুখে। বনহুর আর আশা একসঙ্গে শব্দ করে উঠে এ যে জাহাজের সার্চলাইটের আলো!

আলোটা তাদের উপর পোঁচ বুলিয়ে নিয়ে সরে গেলো দ্রুত। বনহুর আর আশা বুঝতে পারলো জাহাজটা বহু দূরে রয়েছে। এদিকেই যে এগিয়ে আসছে তাও তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

বনহুর বললো—জাহাজটা এদিকেই আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আশা বললো—আশ্চর্য বটে, হিমসাগরে সহসা কোনো জাহাজ দৃষ্টিগোপন হয় না।

বনহুরও এ কথাটা অস্বীকার করতে পারলো না, কারণ হিম সাগর দিয়ে কোনো জাহাজ চলাচল করে না। তীব্র শীতে জাহাজের যাত্রী এবং চালক বা খালাসীদের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে।

অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুর আর আশা।

আশা বললো—এ জাহাজখানা আমার পরিচিত জাহাজ হতে পারে। মাইদী বুড়ীর কাছ থেকে সেই সংকেতপূর্ণ ম্যাপখানার নকল কপি নিয়ে মাইদীর পালিত সন্তান মতিলাল রওয়ানা দিয়েছে— এ জাহাজ তারই হতে পারে।

হাঁ, আমারও ঐরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি বলেছিলে সে আমাদের রওয়ানা দেবার অনেক পূর্বে রওনা দিয়েছিলো।

সে কথা অবশ্য সত্যি। আমার মনে হয়, সে পথ ভুল করে অন্য পথে এগিয়ে গিয়েছিলো, তারপর সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।

জাহাজটা অতি ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, সার্চলাইটের আলো মাঝে মাঝে চক্রাকারে এসে পড়ছে তাদের দেহে।

বনহুর বললো—আশা, মতিলাল নিশ্চয়ই তোমাকে চেনে?

হাঁ, সে আমাকে চেনে তবে সত্যি যদি জাহাজখানা মতিলালের হয় এবং আমাদের যদি ওরা দেখে তাদের জাহাজে উঠিয়ে নেয় তখন আমাকে মতিলাল চিনতে পারবে না।

ভাগ্যিস পুরুষের পরিচ্ছদ তোমার দেহে পরা ছিলো, এমন কি তোমার ক্যাপটাও ভেসে যায়নি। ঠিকই বলেছো আশা, এবার আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা। দেখা যাক, জাহাজখানা আমাদের দেখে উঠিয়ে নেয় কিনা।

ক্রমেই জাহাজের সার্চলাইটের আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

ঐদিকে বনহুর আর আশাকে নিয়ে বরফের চাপটাও দ্রুত ভেসে এগুচ্ছে জাহাজখানার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা এসে পড়লো অতি নিকটে। এবার আশা বলে উঠলো—বনহুর, এই সেই জাহাজ যে জাহাজ নিয়ে মতিলাল হিমসাগরে পাড়ি জমিয়েছে। আমি চিনি, ভালভাবেই চিনি........

বনহুর বললো—যদি তোমার কথা ঠিক হয় তাহলে বুঝবো খোদা আমাদের মন্দের চেয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু এখন ওরা আমাদের দেখতে পেলেই ভাল হয়........

বনহুর নিজের গা থেকে জামাটা খুলে ফেললো এবং প্রতীক্ষা করতে লাগলো, সার্চলাইটের আলো তাদের দেহে পড়ামাত্র সে জামাটা নেড়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানাবে।

আশাও মাথার ক্যাপটা খুলে প্রস্তুত হয়ে রইলো। এবার সার্চলাইটের আলো অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। জাহাজখানার ঝক ঝক শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বিপুল ভরসা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বনহুর আর আশা।

এবার সত্যিই সার্চলাইটের তীব্র আলোর ছটা তাদের বরফের চাপটার উপরে এসে পড়লো, এরপর চক্রাকারে তাদের দেহে ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর জামাসহ হাতখানা দোলাতে লাগলো খুব জোরে। আশাও মাথার ক্যাপটা দ্রুত নাড়তে লাগলো।

এবার সার্চলাইটের আলো স্থির হলো তাদের বরফের চাপটার উপরে।

বনহুর আর আশা বুঝতে পারলো, জাহাজখানা যাদেরই হোক তাদের ওরা দেখে ফেলেছে। একটা আশার আলো দেখা দিলো তাদের মনে।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওরা, জাহাজখানা এবার স্পীড আরও কমিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে ওদের বরফের চাপটার দিকে এগিয়ে আসছে।

হিমেল হাওয়ার সাঁ সাঁ আওয়াজ আর জাহাজখানার মৃদু ঝক ঝক শব্দ মিলে একটা অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি হচ্ছিলো। বনহুর বললো—আশা, এবার আমাদের আর কোনো ভয় নেই। ক্যাপ্টেন সদয় হয়ে আমাদের উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু সাবধান, তোমার পরিচিত লোক হলে তারা যেন তোমাকে চিনে না ফেলে।

সে ব্যাপারে আমি অত্যন্ত সতর্ক আছি। বললো আশা।

বনহুর বললো—তাহলে নিশ্চিন্ত কি বলো?

নিশ্চয়ই। উচ্চারণ করলো আশা।

জাহাজখানা ততক্ষণে আরও নিকটে এসে পড়েছে।

দ্রুত আশা মাথার ক্যাপটা ঠিকভাবে পরে নিলো, তারপর ক্যাপটার কিছু অংশ ঝুলিয়ে দিলো সে সামনের দিকে।

জাহাজখানা থেমে পড়েছে এবার।

জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি নামানো হচ্ছে।

বনহুর নিজেও প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে, কারণ সিঁড়িখানা তাদের সম্মুখে নেমে এলেই তারা যেন উপরে উঠে যেতে পারে।

দড়ির সিঁড়ি একেবারে নেমে এলো নিচে।

উপর থেকে আওয়াজ আসছে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসো, উপরে এসো, দেরী করো না, উপরে এসো......

বনহুর আশাকে লক্ষ্য করে বললো—চট্‌পট্‌ উঠে পড়ো আশা।

তুমি?

আমিও আসছি তোমার পরেই......

আশা চাপা গলায় বললো—এই আমার শেষ কথা তোমার সঙ্গে, কারণ জাহাজে পৌঁছার পর আমি বোবা বনে যাবো।

একটু হাসলো বনহুর।

আশা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখলো।

বনহুর সিঁড়ির নিচের অংশ এঁটে ধরলো।

আশা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

পরক্ষণেই বনহুর সিঁড়ি বেয়ে অতি সহজে জাহাজের ডেকে এসে পৌঁছলো।

আশা ডেকে উঠেই বসে পড়েছে। বনহুর পৌঁছেই বুঝতে পারলো আশার সন্দেহ সত্য হয়েছে, এ জাহাজ তার পরিচিত, এ জাহাজের মালিক তার চেনা লোক। আশা মাথাটা নিচু করে বসে আছে, তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বনহুর দেখলো, তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন অদ্ভুত পোষাকপরা লোক। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হলো সে তাদের দলের নেতা হবে। লোকটার গায়ের রং জমকালো, মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া চুল, বিরাট দেহটা যেন একটা গাছের গুঁড়ি। লোকটার দিকে বনহুর তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার সুরে বললো—আপনাদের অনুগ্রহে আজ আমরা পুনর্জন্ম লাভ করলাম, সেজন্য ধন্যবাদ।

লোকটা আশার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললো—তোমরা এই হিমসাগরের বুকে এলে কি করে?

বনহুর স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলো—জলদস্যুরা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে, তারা আমাদের দু'জনকে হিম সাগরে ফেলে দিয়ে গেছে।

বনহুরের কথা বিশ্বাস করলো লোকটা, সে তবু প্রশ্ন করে বসলো হিমসাগরে ওরা এলো কি করে?

বনহুর বললো—তারা হিমসাগরে আসেনি, হিমসাগরের ধারে একটা তক্তায় হাত-পা বেঁধে ভাসিয়ে দিয়েছিলো, তারপর অতি কষ্টে আমরা আপনাদের সহায়তায় বেঁচে গেছি।

বনহুরের কথা শুনে লোকটার মনে হয়তো দয়ার সঞ্চার হলো, সে লোকজনদের বললো বনহুর ও তার সঙ্গী আশাকে নিয়ে যত্ন করে গরম জামাকাপড় ও গরম খাবার দিতে।

দু'জন লোক আশাকে ধরে তুলতে গেলো।

বনহুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আশাকে ধরে তুলতে তুলতে বললো—তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, আমি ওকে ধরে নিচ্ছি।

বনহুর আশাকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চললো।

যদিও আশাকে ধরে নেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না তবু আশা নিজকে অত্যন্ত অসুস্থের মতই করে নিয়েছিলো, কারণ তাকে দেখে কেউ যেন চিনে না ফেলে।

চলতে চলতে বনহুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো আশা—যা ভেবেছিলাম তাই, এ জাহাজ মতিলালের।

এর বেশি তখন আশা বলার সুযোগ পেলো না, কারণ তাদের আশেপাশে কয়েকজন লোক ছিলো, তাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছিলো তারা।

একটা ক্যাবিন দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওরা, যাবার সময় বললো—তোমরা এ ক্যাবিনে বিশ্রাম করো, আমরা তোমাদের জন্য খাবার ও গরম জামা কাপড় আনছি।

বনহুর যতক্ষণ আশাকে ধরে ধরে এগুচ্ছিলো ততক্ষণ আশা হৃদয়ে এক অপূর্ব শিহরণ অনুভব করছিলো। তার স্বপ্ন, তার সাধনা যেন আজ সার্থক হয়েছে। যে বনহুরকে একটি বার দেখার আশায় সে ছুটে ছুটে আসতো সুদূর কান্দাই জঙ্গলে, হয়তো কোনোবার দেখা মিলতো কোনোবার মিলতো না। তবুতো কাছাকাছি নয়, বহুদূর থেকে সে তাকে দেখে যেতো। আজ সেই কামনার জনতার পাশে একেবারে এত কাছে যা সে কোনো দিন আশা করতে পারেনি।

বনহুর আশাকে ক্যাবিনের একটা শয্যায় বসিয়ে দিয়ে বললো—এবার নিজকে প্রস্তুত করে নাও, কারণ এরা যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে চিনে ফেলতে পারে। হাঁ, যাকে দলের নেতা বলে মনে হলো সেই কি মতিলাল?

হাঁ, তুমি যা সন্দেহ করেছো ঠিক তাই, ঐ ব্যক্তিই মাইদী বুড়ীর পালিত সন্তান মতিলাল।

আমার ধারণা তাই। যাক যা চেয়েছিলাম তাই পেয়ে গেছি। আশা, এবার আমরা নিশ্চিন্ত।

হাঁ। আশা বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললো।

অল্পক্ষণ পর তাদের জন্য গরম জামাকাপড় এসে গেলো। আর এলে কিছু খাবার।

বনহুর গরম কোট ধরনের জামাটা পরে নিলো। অন্য কাপড়ের তার প্রয়োজন ছিলো না।

আশাও তেমন কিছু নিলো না, শুধু একটা ওভারকোট বেছে তুলে নিলো।

খাবার টেবিলে রেখে চলে গেলো লোকগুলো।

বনহুর আশাকে বললো—এদের ভদ্রতা দেখে মনে হচ্ছে আমরা এদের সম্মানিত অতিথি।

আশা একটুখানি হেসে বললো—মিথ্যা তো নয়, দস্যু সম্রাটের জন্য এ তো সামান্য মাত্র। চলো বনহুর, টেবিলে বসা যাক, বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু।

হাঁ চলো, এ সময় ক্যাবিনে কেউ নেই।

বনহুর আর আশা টেবিলে এসে বসলো। আশার দেহে পুরুষের পোষাক রয়েছে। তাকে সহসা দেখলে কেউ নারী বলে বুঝতে পারবে না।

আশা সব সময় কথা বলবে না, সে সবার সামনে বোবা বনে থাকতে স্থির করে নিয়েছে। কণ্ঠস্বর শুনলে ওকে চিনে ফেলতে পারে।

আশা আর বনহুর যখন কথা হচ্ছিলো তখন সেখানে কেউ ছিলো না।

মুখোমুখি বসে খেতে শুরু করে বনহুর আর আশা।

বনহুর গোগ্রাসে খেতে শুরু করে, সেও খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো।

বনহুর যখন আপন মনে খেয়ে চলেছে তখন আশা খাওয়া ভুলে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

খেতে খেতে হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি পড়ে আশার মুখে, বিস্ময়ভরা গলায় বলে—সেকি, তুমি খাচ্ছো না যে?

বনহুরের কথায় লজ্জা পায় আশা, একটু হেসে বলে—এই তো খাচ্ছি। তুমি খাও......

বনহুর পুনরায় খেতে শুরু করে কিন্তু তার মনে তখন একটা প্রশ্ন জাগে, যে প্রশ্ন তাকে আরও বহুদিন ভাবিয়ে তুলেছে। বনহুর এতদিন অন্যান্য নারীর চেয়ে আশাকে ভিন্নরূপে দেখতো। আশাকে সে কঠিন এক নারীমূর্তি বলেই জানতো, যার মনে কোনো হাল্কা আঁচড় দাগ কাটতে সক্ষম হবে না। আজ আশার দৃষ্টিতেও বনহুর দেখতে পায় একটা আবেগময় ভাবের আভাস।

একটু হাসির রেখা ফুটে উঠে তার ঠোঁটের কোণে।

আশা তখন মাথা নিঁচু করে খাচ্ছিলো, তাই সে লক্ষ্য করতে পারে না, তাছাড়া মাথার ক্যাপ দিয়ে ঢাকা ছিলো তার কপাল ও চোখ দুটো।

খাওয়া শেষ হয়। বনহুর ফিরে তাকাতেই অবাক হয়, তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে জাহাজের মালিক মতিলাল। বনহুর তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে মতিলালকে সম্মান দেখালো।

মতিলাল হেসে বললো—যুবক, এখন তোমার সঙ্গী সুস্থ হয়েছে তো?

আশা তখন মাথাটা আরও নিচু করে খাবার খাচ্ছিলো।

মতিলাল এগিয়ে গেলো আশার পাশে, ওর পিঠে হাত রেখে বললো—কেমন লাগছে এখন তোমার?

বনহুরই দ্রুত জবাব দিলো আশার হয়ে—দেখুন ও বোবা, মোটেই কথা বলতে পারে না।

ও তাই বলো বোবা......

হাঁ বোবা। বনহুর কথাটা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, কারণ সে ভেবেছিলো, মতিলাল হয়তো আশার কথাবার্তা শুনে ফেলেছে। এবার বনহুর বুঝতে পারলো। তার সন্দেহ সত্য নয়, মতিলাল আশার কথাবার্তা শুনতে পায়নি।

মতিলাল বললো—তোমার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার বিশ্রাম করে নাও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বনহুর বলে— বিশ্রামের আমার দরকার হবে না, আপনি বলুন কি কথা?

যা বলবো সে কথা এমনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না।

তবে বসুন বসে বলুন।

মতিলাল আশার দিকে তাকালো, তার চোখেমুখে একটা সন্দেহের ভাব ফুটে উঠলো।

বনহুর হেসে বললো—ও কানেও শুনতে পায় না।

এবার মতিলালের মুখোভাব সচ্ছ হলো। এগিয়ে এলো সে একটা চেয়ারের পাশে, বনহুরকে আর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো—বসো।

বনহুর বসলো।

মতিলালও আসন গ্রহণ করলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—তোমাকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

বনহুর কৃতজ্ঞতাভরা গলায় বললো—সেজন্য আমি খুশি হলাম।

মতিলাল বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে— তোমার রূপ দেখে নয়, তোমার বলিষ্ঠ চেহারা দেখে, বুঝলে?

নিশ্চয়ই বুঝেছি।

জানো এই হিমসাগরে আমি কেন এসেছি? নিশ্চয়ই জানো না, জানার কথাও না। এমনি কি, আমার জাহাজের অনেকেই জানে না এ অভিযান আমার কিসের জন্য।

বনহুর মাথা চুলকে বলে—আমি এলাম হিমসাগর থেকে, কি করে জানবো এ অভিযান আপনার কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে।

হাঁ, ঠিক বলেছো যুবক।

আমাকে আপনি জোতিলাল বলে ডাকবেন।

জোতিলাল!

হাঁ। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

আমার নামটা ঠিক তোমারই নামের অনুকরণ, মতিলাল আমার নাম।

চমৎকার। মতিলাল আর জোতিলাল......

এসো তোমার সঙ্গে হাত মিলাই, কারণ আমরা দু'জন আজ থেকে বন্ধু হলাম।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিলো মতিলালের প্রসারিত হাতখানার দিকে।

বনহুরের হাতে হাত মিলাতেই মতিলাল মুখখানা কালো করে ফেললো, পর মুহূর্তে হাতখানা টেনে নিয়ে বললো—তোমার হাতখানা দেখছি বড় মজবুত।

শুধু হাতই নয়, আমার মনটাও......

এ্যা, কি বললে যুবক?

যুবক নয়, জোতিলাল।

হাঁ ভুলে যাই কিনা। কি যেন বললে তুমি?

কিছু না, বলছিলাম ছোটবেলা থেকে কাজ করে করে হাতখানা আমার কেমন কড়া হয়ে গেছে, মানে বড্ড শক্ত তাই...কথাটা বলে হাসে বনহুর।

জোতিলাল!

বলুন?

সত্যি তোমাকে দেখে আমার বুকে অনেক সাহস বেড়েছে। মনে হচ্ছে তুমি কাজের লোক।

আসল কথা বলুন মতিলাল বর্মন।

এ্যা, আমার পদবী জানলে কি করে হে?

আমার পদবী বর্মন কিনা।

ও, তুমি দেখছি একেবারে......

আপনার সহোদর সম।

ঠিক বলছো জোতিলাল।

এবার আসল কথায় আসুন।

হাঁ, বলবো। জানো, এমন একটা জিনিসের সন্ধানে আমি চলেছি যা পৃথিবীর কেউ আজও পায়নি। নাগরাণী সাপের মাথার মণি নীল পাথর।

নাগরাণী সাপের মাথার মণি! অবাক হবার ভান করে বনহুর।

মতিলাল ভাবগম্ভীর হয়ে পড়ে।

বলে চলে মতিলাল কেমন করে সে এই নীল পাথরের সন্ধান পেলো।

আরও বলে মতিলাল—আমি একটা তাবিজ পেয়েছি, যে তাবিজ সঙ্গে থাকলে তাকে সাপ স্পর্শ করতে পারবে না। সে তাবিজ আমি কোথায় পেয়েছি জানো?

বনহুর আরও বোকা বনে যায়, বলে—তা আমি কেমন করে জানবো, আমি তো হিমসাগর থেকে এসেছি।

তা তো নিশ্চয়ই, শোনো তোমাকেই যখন সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি তখন তোমার কাছে কিছু গোপন করা শ্রেয় মনে করি না। তাবিজটা আমার সৎমার কাগজের মোড়ক থেকে বের করে নিয়েছিলাম। কাজেই আমার সৎমা যখন বনহুরকে সেই মোড়কটা দেয় তার পূর্বেই আমি আসল কাগজ আর সেই তাবিজ চুরি করে সরি ফেলি।

বনহুরের চোখটা মুহূর্তে জ্বলে উঠে, মাইদী বুড়ীকে তাহলে মতিলাল ধোঁকা দিয়েছিলো। সর্বনাশ, তার মোড়কের সংকেত পূর্ণ কাগজখানা তাহলে আসল নয় নকল। এ কথা আশাও জানতো না। একবার বনহুর মতিলালের অজান্তে আশার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। আশা তখনও টেবিলে বসে খাওয়ার ভান করছিলো, যদিও তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো অনেক্ষণ। আশাও ঐ কথাটা শুনে একবার কটমট করে তাকালো মতিলালের দিকে। মতিলালের চক্রান্ত তাহলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিলো।

আশা আর বনহুরের চিন্তা তখন একই দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। তারা বুঝতে পারছে, এতদিন যে পথে তারা জাহাজ 'জবরু' নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো সে পথ আসল নয় এবং সেই কারণেই বিপদে পড়তে হয়েছে

অনেক। আসল পথের সন্ধানসহ সংকেতপূর্ণ কাগজখানা আত্মসাৎ করেছিলো মতিলাল। এমন কি তাবিজটাও। যে তাবিজের কোনো উল্লেখই ছিলো না সেই সংকেতপূর্ণ কাগজখানায়।

দ্রুত বনহুর ভেবে নিলো গত ঘটনাগুলো, তারপর বললো—মতিলাল, আমি ঐ কথাটা জানতে চাই দস্যু বনহুরের সঙ্গে আপনার সৎমার কি সম্পর্ক ছিলো যার জন্য সে এমন একটা বহু মূল্যবান সংকেতপূর্ণ কাগজের মোড়ক ও তাবিজ তাকে দিতে যাচ্ছিলো?

শুনেছিলাম আমার সৎমার জীবন রক্ষা করেছিলো সেই শয়তান দস্যুটা। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে—আমাদের রাণী চম্পা সেই শয়তান দস্যুটাকে ভালবাসে, তারই নির্দেশে......

সেই মুহূর্তে বনহুর একবার আশার দিকে তাকালো, দৃষ্টি বিনিময় হলো ওর সঙ্গে। একটু হাসলো বনহুর মতিলালের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

মতিলাল বলে চলেছে—চম্পার চোখকেও আমি ফাঁকি দিয়েছি। সে জানে, মাইদী মা আমাকে ধোঁকা দিয়ে আসল জিনিস তার প্রিয় দস্যু বনহুরকে দিয়েছে কিন্তু......হাঃ হাঃ হাঃ........সব ফাঁকি, সে কাগজ আর তাবিজ এখন আমার হাতের মুঠায়।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—এবার বলুন আমি কি করতে পারি আপনার জন্য?

সত্যি, তোমাকে পেয়ে আমার মনোবল বেড়ে গেছে, মনে হচ্ছে নীল পাথর আমার হাতের মুঠায় এসে গেছে। জানো জোতিলাল, তোমাকে দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যু বনহুর সে এখন ভুলপথে কোথায় চলে গেছে কে জানে! হিমাসাগরের দক্ষিণে গিয়ে পড়লে জমে বরফ বনে যাবে সেই যাদুকরের পাথরমূর্তির মত।

বনহুরও মতিলালের হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে একটু হাসলো। সে মনে মনে ভেবে দেখলো, সত্যি তারা যে পথে অগ্রসর হচ্ছিলো সে পথ অতি ভয়ঙ্কর, কারণ হিমসাগরের দক্ষিণ দিক সেটা, ঐ দিক আরও ঠান্ডা।

মতিলাল আরও কি বলে জানার জন্য উন্মুখ ছিলো বনহুর। মতিলাল বনহুরের কাছে সব বলে শেষে বললো—হঠাৎ তোমাকে ভগবানের দান বলেই আমার মনে হচ্ছে মতিলাল।

আমার এটা ভাগ্য। বললো বনহুর।

মতিলাল এবার বেরিয়ে গেলো বনহুরের কাছে বিদায় নিয়ে। যাবার সময় তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো টেবিলে বসা আশার দিকে।

মতিলাল বেরিয়ে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো আশা। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো সে বনহুরের পাশে, বললো—উঃ কি অসহ্য! এই শয়তান আমার উপর চাল চেলেছে। সত্যি খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ, হিমসাগরে না ভাসলে সঠিক পথের সন্ধান পেতাম না। বনহুর, আমার ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে ওকে হত্যা করি।

বনহুর বললো—এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন আশা। স্থির হয়ে কাজ করো, জানি তুমি যা ভাবছো তা অতি সহজ, কিন্তু.......

বলো থামলে কেন, কিন্তু কি?

মতিলালকে হত্যা করলে তার অনুচরগণ নিশ্চয়ই আমাদের ভালবাসবে না। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, তারপর আমাদের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।

বনহুর, তোমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ মতিলালের অনুচরগণ সবাই আমার অনুগত......

দাস, কি বলো?

তা মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পাবে বনহুর।

তবু তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে আশা।

বুঝেছি তুমি চাও তোমাকে দিয়ে যেমন মতিলাল লালে লাল হতে চায় তেমনি তুমিও তারই দ্বারা......

আশার কথার মধ্যে বলে উঠে বনহুর—লালে লাল নয়, আমি চাই নীলে নীল হতে......

দু'জনে হাসতে থাকে ওরা।

❑

রতের শোয়া নিয়ে একটু মুস্কিল হলো। যে ক্যাবিনে বনহুর আর আশাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো সে ক্যাবিনটা ছিলো নিতান্ত ছোট। একপাশে একটিমাত্র লোহার খাটে বিছানা পাতা ছিলো, তাও সামান্য মাত্র।

বনহুর আশাকে কিছু ভাবতে দেখে হেসে বললো—চিন্তার কোনো কারণ নেই, রাতটা আমার দিনের মত, কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না, ডেকে অনেক জায়গা আছে।

আশা মনে ব্যথা অনুভব করলেও তেমন কোনো আগ্রহ দেখাতে পারলো না। বিছানা থেকে কম্বল ও বালিশটা তুলে বাড়িয়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো—ওসব আমার না হলেও চলবে।

আশা গম্ভীর গলায় বললো—আমারও অভ্যাস আছে বনহুর। শয্যা ছাড়া আমিও ঘুমাতে পারি।

বনহুর শুধু কম্বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় বলে গেলো—বালিশটা মাথায় দিয়ে ভাল করে ঘুমাও।

রাতে ঘুমাবার সময় ছিলো না বনহুরের।

কিছুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে ডেকে বসে ছিলো, প্রতীক্ষা করছিলো কোনো এক মুহূর্তের।

আশাও কিন্তু শয্যা গ্রহণ করতে পারেনি, সেও বসে বসে ভাবছিলো কোনো কথা।

রাত বেড়ে চলেছে।

জাহাজখানা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। সার্চলাইটের আলো সম্মুখস্থ বরফ চাপগুলোর উপর ছড়িয়ে পড়ছে। হিমসাগরে হিমেল হাওয়া যেন বরফ ছড়াচ্ছে।

বনহুর কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে চললো সে সন্তর্পণে জাহাজের অন্য ক্যাবিনগুলোর দিকে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এদিক সেদিক দেখতে লাগলো তাকিয়ে তাকিয়ে। বিস্মিত না হয়ে পারলো না বনহুর, কারণ জাহাজখানা একটু ভিন্ন ধরনের। জাহাজখানায় মাত্র দু' একটা ক্যাবিন, কিন্তু এতগুলো লোক গেলো কোথায়! বনহুর বেশ বুঝতে পারলো, জাহাজের তলভাগে কিছুসংখ্যক ক্যাবিন আছে।

বনহুর যখন এগুচ্ছে তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লো কিছুদূরে অন্ধকারে একটি ক্যাবিনের পিছনে জমকালো পোশাক পরা একটা ছায়ামূর্তি ক্যাবিন আছে।

বনহুর যখন এগুচ্ছে তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লে কিছুদূরে অন্ধকারে একটি ক্যাবিনের পিছনে জমকালো পোশাক পরা একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে কিছু করছে।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর, নিজকে একটা ক্যাবিনের আড়ালে লুকিয়ে লঘু পদক্ষেপে অগ্রসর হলো। বেশি বিলম্ব হলো না বনহুরের ছায়ামূর্তির পাশে পৌঁছতে। নিকটে পৌঁছেই বলিষ্ঠ হাতে জড়িয়ে ধরলো, একচুল যেন সে নড়তে না পারে।

একি......বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে কোমল একটা দেহের সংস্পর্শ অনুভব করতেই দ্রুত মুক্ত করে দিলো সে ছায়ামূর্তিটাকে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর—আশা!

ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো আশা—চুপ!

আশার কণ্ঠ শুনে মনে হলো সে একটুও ঘাবড়ে যায়নি বনহুরের আচম্‌কা আক্রমণে।

বনহুর বললো—আশা, মাফ করো, ভুল হয়েছে।

একটু হেসে বললো আশা—সে দেখা যাবে পরে! এবার শোনো বনহুর, এই ক্যাবিনের ভিতরে রয়েছে একটা চোরা সিঁড়ি, ঐ সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নিচে নেমে যেতে হবে।

তারপর?

তারপর একটা ক্যাবিন আছে সেই ক্যাবিনে থাকে মতিলাল এবং সেখানেই আছে সেই আসল সংকেতপূর্ণ কাগজ আর তাবিজটা। বনহুর, তোমাকে পেয়ে আমার ভালই হলো, ভেবেছিলাম একাই পারবো কিন্তু ঐ শয়তানটার সঙ্গে আমি দেখা দিতে চাই না।

বলো এবার কি করতে হবে?

পারবে এই ক্যাবিনের দরজাটা খুলে ফেলতে?

চেষ্টা করে দেখতে পারি। বনহুর অল্পক্ষণের চেষ্টায় কৌশলে খুলে ফেললো ক্যাবিনের দরজাটা।

আশা প্রথম ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

অবশ্য বনহুর প্রথমে ক্যাবিনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, আশা বাধা দিলো—দাঁড়াও, আমি চাই না তোমার কোনো বিপদ ঘটে।

হাসলো বনহুর।

ক্যাবিনে আশা প্রবেশ করে চাপাকণ্ঠে ডাকলো—এসো।

বনহুর বললো—জমাট অন্ধকারে কিছু নজরে আসছে না।

আমার হাত ধরো। আশা বনহুরের দিকে হাত বাড়ালো।

বনহুর আশার হাতখানা ধরে বললো—পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বনহুর যে আশার সঙ্গে ঠাট্টা করছে এটা আশা বেশ বুঝতে পারলো, তবু বললো—এসো।

আশার হাত ধরে অন্ধকারে অন্ধের মত এগুচ্ছিলো বনহুর। বললো—আঃ কি গরম তোমার হাতখানা আশা। আমার সমস্ত দেহখানা তোমার হাতের পরশে......

থাক, এবার দাঁড়াও।

সোজা হয়ে?

হাঁ।

আশা বনহুরের হাত মুক্ত করে সরে যায়। ওপাশের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সব যেন তার পরিচিত। দেয়ালে অন্ধকারে হাত রেখে একটা বোতামে চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে একটা আলোক রেখা ফুটে উঠে। মেঝের কিছুটা লম্বালম্বি ফাঁক হওয়ায় নিচের আলোকরশ্মিটা ভেসে উঠে মেঝের তক্তার ফাঁকে।

আশা চাপাকণ্ঠে বলে—তক্তার ফাঁকে দৃষ্টি রাখো বনহুর।

বনহুর এবার মেঝেতে উবু হয়ে আলোর রেখার ফাঁকে নজর ফেললো। অবাক না হয়ে পারলো না সে, কারণ যা সে দেখলো সত্যিই অদ্ভুত। দেখলো নিচের এক ক্যাবিনে উজ্জল আলো জ্বলছে। ক্যাবিনের মেঝেতে কয়েকটা হাতলবিহীন চেয়ারে বসে আছে কয়েকজন লোক। প্রত্যেকটা লোকের শরীরে জীবজন্তুর পশমে তৈরি ভারী জামা। জামার কলারে বড় বড় পশম, সেই পশমে লোকগুলোর মুখ অর্ধেক ঢাকা পড়েছে। তবু বনহুরের চিনতে বাকি হয় না দক্ষিণ পাশে বসে আছে মতিলাল।

মাঝখানে বিরাট একটা অগ্নিকুন্ড জ্বলছে। আগুনের কুন্ডটার গণগণে আগুনের আলোতে লোকগুলোকে অদ্ভুত জীব বলেই মনে হচ্ছে। মাথায় পশমের টুপি।

বনহুরের কানে ভেসে এলো মতিলালের কণ্ঠস্বর—ওকে দিয়েই আমি কাজ উদ্ধার করবো।

আর একটি কণ্ঠ—তারপর?

নীল পাথর হাতে এলেই ওকে জীবন্ত কবর দেবো।

কোথায়?

হিমসাগরের বরফের তলায়।

দস্যু বনহুর নীল পাথরের সন্ধানে হিমসাগরে পাড়ি জমিয়েছে, সে যদি জানতে পারে নীল পাথর তোমার হস্তগত হয়েছে তাহলে?

নন্দলাল, তুমি মতিলালকে চেনো না, দস্যু বনহুরকে সে থোরাই কেয়ার করে।

তুমিও ওকে ঠিক চেনো না মতিলাল, সে কত ভয়ঙ্কর! তোমাকে সাবধানে কাজ করতে হবে। নীল পাথর হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে খতম করে দেবে বুঝেছো, হিমসাগরে এনে বরফের তলায় কবর দেবার অপেক্ষা করো না।

সে আর তোমাকে বলতে হবে না নন্দলাল। তবে আমার ভয় আর একজনকে, সে হলো রাণীজী। রাণীজী যদি জানতে পারে আমি মাইদী মার কাছ থেকে আসল ম্যাপখানা ও তাবিজ সরিয়ে ফেলেছি তাহলে........

তোমার নীল পাথরের স্বপ্ন ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে।

হাঁ, ঠিকই বলেছো নন্দলাল। জানি না রাণীজী কে কোথায় সে থাকে আর কোথায় সে চলে যায়। শুধু এইটুকু জানি, রাণীজী দস্যু বনহুরের প্রেমে পাগলিনী হয়েছে........

এবার কথা বলে নন্দলাল—আমি জানি দস্যু বনহুরের প্রেম পাগলিনী রাণীজীর সব স্বপ্ন ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে.......

বনহুর আর শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করে না, সে দ্রুত এগিয়ে যায় আশার পাশে, তারপর চাপকণ্ঠে বলে—চলো, এখন ওরা প্রেম কাহিনী নিয়ে আত্মহারা রয়েছে। যখন মতিলাল তার ম্যাপ খুলে বসবে তখন আমাদের কাজ শুরু করবে।

আশা হাতখানা সরিয়ে নেয় দেয়ালের বোতাম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যায়, মুছে যায় আলোর রেখাটা। সমস্ত ক্যাবিনটা জমাট অন্ধকারে ভরে উঠে।

বনহুর ঠাট্টা করে বলে—অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বনহুরের কথা শুনে মৃদু হেসে হাতখানা বাড়িয়ে দেয় আশা তার দিকে।

বনহুর হাতখানা ধরে বলে—চলো।

ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই আবার হিম ঠান্ডা স্পর্শ করে ওদের দেহটাকে।

বনহুর বলে—রাত আর বেশি নেই, এবার ঘুমাবে যাও।

আর তুমি?

ঘুম......ঘুম আমার চোখে আসবে না।

তবে আমিও ঘুমাবো না আজ।

তা হয় না আশা, তুমি মেয়েমানুষ—নরম শরীর, হঠাৎ কোনো অসুখ—বিসুখ করে বসবে।

বনহুর, তোমার মুখে আজ এমন কথা শুনে সত্যি আমার ঘুম পাচ্ছে। কোনোদিন কেউ আমাকে এমন করে বলেনি। ছোট্ট বেলায় মাকে হারিয়েছি, বাবার পরিচয় জানি না। যাকে বাবা বলে জানি সে মানুষ নয়, নরপিশাচ। সেই নরপিশাচ বাবার কছে চিরকাল কঠিন আচরণ পেয়ে মনটা আমার বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। কঠিন এক নারী মূর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে নিজের অজ্ঞাতে। জীবনটা আমার বড় শুষ্ক, বড় বেদনার। সবাই আমাকে পেতে চেয়েছে কুৎসিত এক কামনা নিয়ে কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চেয়েছিলাম......থাক, আজ নয় আর একদিন বলবো।

আশা, যা বলতে চাও বলো, আমি শুনতে রাজি আছি; কারণ এখন আমি কোনো কাজে ব্যস্ত নই। চলে তোমার ক্যাবিনে যাই, বাইরে বড় ঠাণ্ডা!

আমার ক্যাবিন?

হাঁ।

কেন, তোমার নয়?

ও ক্যাবিনে তুমিই শোবে, বিশ্রাম করবে, আমার জন্য ডেক রয়েছে।

বেশ, চলো! আশা একথা বলে অগ্রসর হলো।

বনহুর ও আশা ক্যাবিনে ফিরে এলো।

দরজা বন্ধ করে দিলো বনহুর।

আশা বললো—বসো।

আশা নিজেও বসলো।

বনহুর শয্যায় লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে বড় ক্লান্তি বোধ করছিলো সে। দক্ষিণ বাহু মাথার নিচে রেখে তাকালো বনহুব আশার মুখের দিকে।

আশার মাথায় এখন ক্যাপ নেই, চুলগুলো তার ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাবিনের স্বল্প উজ্জ্বল আলোতে আশার মুখ খানাকে বড় করুণ লাগছিলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর ওর মুখের দিকে—অদ্ভূত নারী এই আশা।

আশাকে নীরব দেখে বলে বনহুর—তারপর বলো আশা কি চেয়েছিলে তুমি?

আশা ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুরের দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে তার মুখে, আশা দৃষ্টি নত করে নিলো। ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে থেমে গেলো।

বনহুর বললো—বলতে আপত্তি থাকলে বলো না।

না, কোনো আপত্তি নেই, আমি সব বলবো।

বলো?

না, না, পারবো না, বলতে পারবো না......আশা চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বনহুর খপ্ করে ধরে ফেলে ওর হাতখানা।

বলে বনহুর—আশা, তুমি না বললেও আমি জানি—জানি তুমি কি চেয়েছিলে? বসো।

আশাকে জোর করে বসিয়ে দেয় বনহুর নিজের পাশে।

আশার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে।

বনহুর এবার উঠে বসে আশার চিবুকটা তুলে ধরে। আশার ছল ছল আঁখি দুটির দিকে তাকিয়ে বলে—ছিঃ তোমার চোখে অশ্রু মানায় না আশা, তুমি তো অন্যান্য নারীর মত সাধারণ মেয়ে নও।

আশার চিবুকে বনহুর যখন হাত রাখলো তখন আশা তার হাতদু'খানা দিয়ে বনহুরের হাতটা চেপে ধরলো, বললো সে—তুমি জানো না, আমি যা চেয়েছিলাম তা আকাশের চাঁদের মতই দুস্প্রাপ্য.....

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে।

আশা বনহুরের মুখে তাকায় বিস্ময়ভরা চোখে, বনহুর যখন আপন মনে হাসে তখন তাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

আশা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—এ পৃথিবীতে কিছুই দুস্প্রাপ্য নয় আশা। তুমি শোনোনি চাঁদকেও এই পৃথিবীর মানুষ জয় করেছে? একটু থেমে বলে—চাঁদের স্নিগ্ধ আলো দূর থেকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করলেও চাঁদের আসল রূপ কঠিন কালো নিরস, বুঝলে? কাজেই চাঁদের আলো শুধু মানুষকে মোহগ্রস্তই করে—দিতে পারে না কিছু।

আশা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে—বনহুর!

জানি তুমি চেয়েছিলে একটা নির্মল পবিত্র ভালবাসা।

হাঁ, তাই চেয়েছিলাম বনহুর, আমি তাই চেয়েছিলাম।

বনহুর আবার আশার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে...আশা, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমায় ভালবাসি যদি আমাকে তুমি ঘৃণা না করো।

বনহুর তুমি এত মহৎ......

আশা!

ওটুকুই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। একদিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমার সমস্ত পাওনা আদায় করে নিয়েছিলাম—সব আশা আমার পূর্ণ হয়েছিলো সেদিন , তবু একটা ব্যথা ছিলো, আজ তা পূর্ণ হলো। তুমি চাঁদের চেয়েও দুস্প্রাপ্য বনহুর, তুমি........

আশা......এবার তুমি ঘুমাও, আমি যাই।

বনহুর বেরিয়ে যায় ক্যাবিন থেকে।

আশা নিজের হাতখানাকে বারবার চুম্বন করে, এখনও সে বনহুরের হাতের স্পর্শ অনুভব করছে তার হাতের মুঠায়।

হাঁটু গেড়ে বসে ধাক্কা দিলো মতিলাল বনহুরের শরীরে। এই জোতিলাল, এখানে ঘুমাচ্ছো কেন?

ধড়মড় করে উঠে বসলো বনহুর, চোখ রগড়ে তাকালো সে চারদিকে। বুঝতে পারলো বনহুর, সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো ডেকের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে খেয়াল নেই, বেলা উঠে গেছে অনেকদূর। রোদ্দের তাপে আরাম পেয়ে ঘুমটা আরও জমাট বেঁধে উঠেছিলো।

বনহুরকে চোখ রগ্ড়াতে দেখে বললো মতিলাল—এই কঠিন শীতে ক্যাবিনের বাইরে কেন শুয়েছিলে শুনি?

তাইতো, এখানে কখন এলাম!

তা জানো না?

না তো!

আচ্ছা বোকা দেখছি তুমি!

দাঁড়ান আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে আসি আমি কি করে ডেকে এলাম।

থাক, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তোমার বন্ধু ক্যাবিনের দরজায় শক্ত করে খিল এঁটে এখনও নাক ডাকাচ্ছে।

তাই নাকি! বড় বেঈমান দেখছি, আমাকে ঠান্ডায় শুইয়ে সে আরামে নাক ডাকাচ্ছে। আমি ওকে কাল ঠান্ডায় শোয়াবো।

থাক, পরে যা হয় করো, এবার আমার সঙ্গে চলো, কাজ বুঝিয়ে দেবো।

কাজ?

হাঁ, ঐ যে সেদিন তোমায় বলেছিলাম......

ও হাঁ হাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে। নীল কাঁচ না কি যেন বলেছিলেন?

হেসে উঠলো মতিলাল—নীল কাঁচ নয়, নীল পাথর।

বনহুর নামটা উচ্চারণ করে আপন মনে—নীল পাথর।

হাঁ, তোমাকে ঐ পাথর এনে দিতে হবে, পারবে?

খুব...খুব পারবো, আপনাকে তো কথা দিয়েছি।

তবে চলো।

বনহুর কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো, এগুলো সে মতিলালের সঙ্গে।

মতিলাল বনহুরকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই ক্যাবিনটার দরজায় এসে থামলো।

বনহুর দেখলো। দরজার বাইরে একটা বোতাম আছে, সেই বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো।

মতিলাল বনহুরকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাবিনটার মধ্যে প্রবেশ করলো। আজ দিনের আলোয় ক্যাবিনটাকে সে ভালভাবে দেখে নিলো। কাল আশা তার হাত ধরে ক্যাবিনের যে স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছিলো সেই স্থানে দাঁড়ালো বনহুর, ওদিকের দেয়ালে পাশাপাশি কয়েকটা বোতাম। কাল অন্ধকার হলেও আশা ঠিকমতই বোতাম খুঁজে পেয়েছিলো। এ জাহাজখানার সবকিছু আশার পরিচিত। মেঝের দিকে তাকালো সে, কাল রাতে যেখানে আলোর রেখা দেখেছিলো, দেখেছিলো জাহাজের নিচের সেই গোপন ক্যাবিনে মতিলালের গোপন আসর।

বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ে, মতিলাল বলে—একটু সরে দাঁড়াও জোতিলাল।

বনহুর বোকা সেজে বললো—কোন্ দিকে?

পিছনে সরে দাঁড়াও, ঠিক আমার পাশে।

বনহুর পিছিয়ে এলো মতিলালের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে মতিলাল বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে মেঝের এক জায়গায় ছোট্ট একটা স্প্রিং-এ চাপ দিলো। এবার মেঝের কিছুটা অংশ দ্রুত নেমে চললো নিচের দিকে।

বনহুর প্রথমেই আঁচ করে নিয়েছিলো মতিলাল তাকে নিয়ে ঐ ক্যাবিনে যাবে এবং তার কাজ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবে।

একেবারে পূর্ব দিনের সেই ক্যাবিনের মেঝেয় এসে থামলো বনহুর আর মতিলাল। চারকোণা যে তক্তাখন্ড তাদের বয়ে নিয়ে নিচে নেমে এসেছিলো, এবার মতিলাল সেই তক্তাখন্ড থেকে নেমে দাঁড়ালো, বনহুরকেও নিচে নেমে দাঁড়াবার জন্য বললো।

বনহুর মতিলালের নির্দেশমত নেমে পড়লো মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে তক্তাখন্ড সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে গেলো।

বনহুর তাকালো ক্যাবিনটার মধ্যে।

মেঝের মাঝখানে এখনও অগ্নিকুন্ডটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। যে স্থানে অগ্নিকুন্ডটা জ্বলছে সে স্থানে মেঝেটা কৌশলে তৈরি ছিলো, কাজেই জাহাজের কোনো ক্ষতি হবার উপায় ছিলো না। অগ্নিকুন্ডের জন্য ক্যাবিনটা বেশ গরম ছিলো। অগ্নিকুন্ডের চারপাশে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো আছে কতকগুলো হাতলবিহীন চেয়ার।

মতিলাল এরই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—জ্যোতিলাল, এ সময়ে তোমাকে আমি ঈশ্বরের দান বলেই গ্রহণ করেছি। নাহলে তুমি ভাসতে ভাসতে ঠিক আমার জাহাজের তলায় এলে কি করে! যাক, এবার কাজের কথা, যে কাজ তোমকে দেবো তা অতি সহজ কাজ।

বনহুর একটু হাসলো।

মতিলাল বলে চলেছে—আমি তোমাকে যে পথে চালাবো সেই পথে চলতে হবে, বুঝেছো?

নিশ্চয়ই চলবো।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

কষ্ট হবে একটু......

সহ্য করে নেবো।

কাজ সিদ্ধ হলে পাবে অনেক—অনেক টাকা।

যা খুশি দেবেন মতিলাল ভাই।

ভাই নয়, দাদা।

বেশ, তাই হবে।

শোনো।

বলুন?

আজ সমস্ত দিন আর রাত চলার পর আমরা হিমসাগরের তীরে বন্ধ্যা নামে একটা জঙ্গল পাবো, সেখানে নোঙ্গর করবো।

বন্ধ্যা জঙ্গল?

হাঁ।

এ জঙ্গল আমাদের অতিক্রম করতে হবে, তুমি আর আমি দু'জনে যাবো, বুঝলে?

তারপর?

এরা সবই, মানে আমার সঙ্গী-সাথীরা জাহাজেই থাকবে।

তারপর?

বন্ধ্যা জঙ্গলের মধ্যে আছে একটা পর্বত, সে পর্বতের নাম কোরা পর্বত।

কোরা!

হাঁ, সেই পর্বতে পৌঁছতে পারলে......

কি হবে?

এত বোকা তুমি জ্যোতিলাল! তোমাকে একটু আগে বললাম ঐ নীল পাথরের কথা, সেই নীল পাথর আছে সেখানে। অতি মূল্যবান সে পাথর......

ও, এবার ঠিক বুঝতে পেরেছি।

তুমি রাজি?

রাজি।

তোমার সঙ্গী বোবাটিকে রেখে যেতে হবে আমার জাহাজে।

একটু ভেবে বললো বনহুর—ও তো আমাকে ছাড়া থাকতে চাইবে না।

ওকে তুমি বুঝিয়ে দিও তোমার কোনো বিপদ ঘটবে না, ফিরে এসে আবার দু'জন মিলিত হবে।

আচ্ছা।

এবার এসো আমার সঙ্গে। মতিলাল আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। এগুতে লাগলো সে ক্যাবিনের একদিকে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মতিলাল, কি যেন ভাবলো, তারপর দেয়ালে একটা সুইচে আংগুল দিয়ে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের তক্তার দেয়াল একপাশে সরে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করে দেখলো ওপাশে গভীর গর্ত, গর্তের নিচে হিমসাগরের জলরাশি প্রচন্ড বেগে তোলপাড় করছে। জাহাজের তলদেশে ওটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বনহুর ভাল করে তাকালো, দেখলো একটা ধারালো চাকা সেখানে বন বন করে ঘুরছে। চাকাটা তীব্র আকারে ঘুরছে এবং তারই আঘাতে হিম সাগরের বরফের চাপগুলো কেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যেন ভয়ঙ্কর একটা দানব সেখানে তোলপাড় করছে।

মতিলাল বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—যদি কোনোরকম চালাকি করো বা আমার আদেশমত কাজ না করো তাহলে তোমাকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

বনহুর মুখে ভীত ভাব টেনে বললো—সর্বনাশ, আমাকে আপনি হত্যা করতে চান?

চাই না, তবে প্রয়োজন হলে করবো।

আমাকে আপনি যা আদেশ করবেন সেইমতই কাজ করবো।

বড্ড ভয় পেয়ে গেছো, না?. ....কথাটা বলতে বলতে পুনরায় দেয়ালের দ্বিতীয় সুইচে চাপ দেয় মতিলাল। তৎক্ষণাৎ তক্তার দেয়ালটা যেমন ছিলো তেমনি হয়ে যায়। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—আমার নির্দেশ মেনে চললে ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না বরং নীল পাথর যদি তুমি আমার হাতে এনে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনকুবের‍ু করে দেবো, কোনো অভাব তোমার থাকবে না। আর পাবে সুন্দরী এক নারী, যাকে মানাবে তোমার সঙ্গে সোনায় সোহাগা, বুঝলে?

ঢোক গিললো বনহুর।

অট্টহাসি হাসলো মতিলাল—ঘাবড়াবার কিছু নেই। নারীটিকে জানো? তা জানবে কি করে, তুমি তো এলে হিমসাগর থেকে। নারীটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী...একটু আনমনা হয়ে যায় মতিলাল। তারপর বলতে থাকে—সে আমাদের রাণীজী আশা।

বনহুর একটু কেশে নিজকে স্বাভাবিক করে নিলো।

মতিলাল বলেই চলেছে—রাণীজী বলেই তকে আমি কোনো প্রস্তাব দিতে পারিনি, তাছাড়া আমার তো আর তোমার মত এত সুন্দর চেহারা নয়......

বনহুর মুখখানা কাঁচুমাঁচু করে বলে—রাণীজী বিয়ে করবে আমাকে, কি যে বলেন মতিলাল দাদা! আমি একজন গরিব বেচারী—পথের ফকির বলা চলে......

তখন তুমি পথের ফকির থাকবে না, রাজা হবে, বুঝলে?

শুনেছি রাজা-মহারাজা আর ধনকুবেরুদের শত্রু দস্যু বনহুর?

সে কথা মিথ্যা নয় তবে তোমার কোনো ভয় নেই। দস্যু বনহুর...সে এখন হিমসাগরের কোন্ অতল গহ্বরে কে জানে। কারণ যে সংকেতপূর্ণ ম্যাপখানা নিয়ে সে হিমসাগরে পাড়ি জমিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আসল ম্যাপ এখন আমার হাতে, আমিই শুধু জানি সেই পথের সন্ধান। তারপর আপন মনে মতিলাল হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ, রাণীজীকেও আমি ধোঁকা লাগিয়েছি। সেও জানে, তার বনহুর মাইদীমার কাছে আসল ম্যাপ পেয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ...তারপর হাসি থামিয়ে বলে—যাও, কিন্তু মনে রেখো, এসব কথা যেন তোমার ঐ বোবা সঙ্গী জানতে না পারে।

বনহুরকে পাশে রেখে ক্যাবিনটার দেয়ালের সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে মেঝের সামান্য অংশ নেমে এলো নিচে।

মতিলাল বনহুরকে বললো—ওর উপরে দাঁড়াও।

বনহুর ওর নির্দেশ মেনে নিলো।

তক্তার খন্ডটা এবার বনহুরকে নিয়ে সাঁ সাঁ করে উঠে গেলো উপরে।

মাত্র একদন্ড, তারপর সেই ক্যাবিনে ফিরে এলো যে ক্যাবিনে তারা প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, তারা এতক্ষণ জাহাজখানার তলদেশের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলো, এবার তারা পৃথিবীর আলোতে ফিরে এসেছে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সম্মুখে আশাকে দেখতে পেলো বনহুর, আশার চোখেমুখে একটা উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছিলো। বনহুরকে দেখতে পেয়ে তার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু কোনো শব্দ সে উচ্চারণ করলো না।

বনহুর বললো—চলো বন্ধু, ক্যাবিনে চলো।

আশা নীরবে অনুসরণ করলো বনহুরকে।

ওরা দু'জনে ফিরে এলো নিজেদের ক্যাবিনে।

বনহুর দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এলো আশার পাশে—খুব বুঝি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলে?

আশা গম্ভীর মুখে বললো—উদ্বিগ্ন হবার কারণই বটে, আমি জানি মতিলাল কতবড় শয়তান। হীরালাল আর মতিলাল দু'জন সহোদর হলেও ওরা দু'জন আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—মতিলাল হীরালালের সহোদর?

হাঁ, কিন্তু ছোটবেলায় মতিলালকে মাইদী বুড়ী লালন-পালন করার জন্য ওদের মায়ের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলো। ওরা দু'জনাই আমার অনুচর হিসেবে কাজ করছিলো। এ জাহাজখানাও আমারই ছিলো......

এটা আমি পূর্বেই বুঝতে পেরেছি। এ জাহাজ তোমার ছিলো এখনও তোমারই আছে। তুমি শুধু এ জাহাজের অধিকারিণী নও, এ জাহাজে যারা অবস্থান করছে তাদের সকলেরই রাণী। আমাকেও তুমি তোমার একজন অনুগত অনুচর মনে করতে পারো আশা, কারণ তোমার সাহায্য নিয়েই এখন আমাকে চলতে হবে।

আশা মাথার ক্যাপটা খুলে রাখলো টেবিলে।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আশার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললো—সব সময় সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। আপাতত তুমি পুরুষ এবং সম্পূর্ণ বোবা, কারণ এ সময়ে তোমাকে হারালে আমি অসহায় হয়ে পড়বো আশা......

আশার চোখ দুটো ছলছল হয়ে আসে, বলে সে—বনহুর, তোমার স্বপ্ন, তোমার সাধনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি হারিয়ে যাবো না।

বনহুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে, একটা উন্মত্ত আশা জাগে তার মনে, আজকের দিনে ওকেই সে তার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করে। কতদিনের চেনা, কত দিনের পরিচিত যেন সে, যুগ যুগ ধরে সে যেন আছে তার পাশে তার সহচরী সঙ্গিনী বান্ধবী হিসেবে।

আশা বনহুরের দৃষ্টির কাছে নিজকে স্থির রাখতে পারলো না, সে মাথা নত করে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিনের দরজা খুলে।

সমস্ত দিনটা কেটে গেলো।

জাহাজটা একটানা এগিয়ে চলেছে।

সমস্ত দিন মতিলালকে দেখা না গেলেও সন্ধ্যার পর সে বনহুরের ক্যাবিনে এসে হাজির হলো।

নানারকম কথাবার্তা চললো তার সঙ্গে।

আশাও কিন্তু ছিলো সে ক্যাবিনে। অন্যদিকে মুখ করে সব শুনছিলো সে।

এখানে যখন বনহুর আর মতিলাল কথা হচ্ছিলো তখন হিমসাগরে এক অজানা স্থানে বনহুরের জাহাজ 'জবরু' বরফ চাপের সঙ্গে আটকা পড়ে যায়। এদিকের জলরাশি প্রায়ই জমে বরফ আকার ধারণ করেছে, কাজেই জাহাজ কোনোদিকে অগ্রসর হতে পারছিলো না।

রহমান তার সঙ্গীদের নিয়ে সর্দারের সন্ধানে উন্মাদের মত হয়ে উঠেছিলো। একি সর্বনাশ হলো তাদের, শেষে সর্দারকে হারালো তারা।

অনেক সন্ধান করেও রহমান ও তার দলবল কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। বরফ চাপের মধ্যে এমনভাবে আটকা পড়ায় তারা জাহাজ নিয়ে কোনোদিকে এগুতে পারছিলো না। জাহাজে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য থাকায় জীবন রক্ষায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটলেও ঠান্ডায় বড় কষ্ট হচ্ছিলো। সব সময় তারা একরকম ক্যাবিনের মধ্যে কাটাচ্ছিলো। যখন রৌদ্র প্রখর তাপ ছড়াতো তখন শুধু ওরা বের হতো বাইরে, বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতো দূরে বহু দূরে তাদের সর্দারের কোনো সন্ধান পায় কিনা।

এই দু'দিনেই রহমান সঙ্গীদের নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলো। নানারকম পরামর্শ চলছিলো...কি করা যায়, কিভাবে এই হিমসাগর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। ওয়্যারলেসে তাদের বিপদবার্তা কান্দাই আস্তানায় জানিয়ে দিয়েছে, আরও জানিয়েছে তাদের সর্দার বনহুরের বিপদের কথা। জম্বু, সিন্ধি, ফারহা আস্তনাতেও এ সংবাদ পৌঁছে যায়।

নূরীর কানেও পৌঁছে এ সংবাদ। সে বনহুরের বিপদের কথা জানতে পেরে আকুল হয়ে উঠে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, হিমসাগরে যাবার কোনো উপায়ই নেই তার।

কান্নায় ভেংগে পড়ে নূরী।

নাসরিন ও বৃদ্ধ দাইমা অনেক করে বোঝায়, অনেক সান্ত্বনা দেয় তাকে। বৃদ্ধা বলে—নূরী, কাঁদিস্ না মা, আমার মন বলছে মহাবিপদ এলেও সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। খোদা ওর সহায় আছেন। তুই খোদাকে ডাক, তিনিই ওকে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।

আজ বৃদ্ধার কথায় নূরীর মন ভরে উঠে, একটা সান্ত্বনা পায় সে মনে, তার বনহুর তো কোনো অন্যায় করেনি বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়নি— অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার সংগ্রাম, কাজেই জয় তার হবেই।

নূরী খোদার কাছে মনপ্রাণে বনহুরের বিপদমুক্তির জন্য কামনা করতে থাকে।

কান্দাই আস্তানায় যখন সকলে বনহুরের বিপদ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন তখন কান্দাই শহরে চৌধুরীবাড়িতে মরিয়ম বেগম জায়নামাজে বসে খোদার এবাদতে মশগুল। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে পুত্রের জন্য দোয়া করতে থাকেন। হয়তো মায়ের প্রাণে পুত্রের কোনো অমঙ্গল আশঙ্কা জেগে উঠেছিলো।

মা মরিয়ম বেগম যখন খোদার দরগায় মোনাজাত করে চলেছেন। তখন মতিলাল বনহুরের হাতে ম্যাপটা তুলে দিয়ে বলে—তোমাকে সব বুঝিয়ে দিলাম জ্যোতিলাল, ঠিক এই ম্যাপ ধরে কাজ করবে। আর এই নাও তাবিজ, এ তাবিজ যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবে ততক্ষণ তোমাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না। নীল পাথর নিয়ে ফিরে এলেই তুমি পাবে প্রচুর অর্থ আর সেই নারী, যে নারীরত্ন পেয়ে তুমি ধন্য হবে জ্যোতিলাল......হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যি তোমাকে পেয়ে আমি যেমন ধন্য হয়েছি।

বনহুর ম্যাপ বা সংকেতপূর্ণ কাগজখানা মেলে ধরে দেখতে থাকে, তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে ঐ নকল সংকেতপূর্ণ কাগজের খন্ড খানা, যে কাগজখানা রয়ে গেছে তার জাহাজে ওভারকোটের পকেটে।

ভোর হয়ে এসেছে।

বনহুর ম্যাপ আর তাবিজটা হাতে ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আশা তো তার শয্যায় নেই, শয্যা খালি। বনহুর ক্যাবিনের বাইরে এসে তাকালো চারদিকে আশার সন্ধানে! একটা দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়ে গেলো বনহুরের মনে, তবে কি মতিলাল আশাকে চিনতে পেরেছিলো? বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই, মতিলাল তাকে বন্ধ্যা জঙ্গলে নামিয়ে দেবে। বন্ধ্যা জঙ্গলের নিকটে পৌঁছে গেছে তাদের জাহাজখানা।

বন্ধ্যা জঙ্গলটাকে তাদের জাহাজ থেকে এক ভয়ঙ্কর স্থান বলে মনে হচ্ছিলো। হিমসাগরের তীরে গভীর জঙ্গলে যেন এক এলোকেশী রাক্ষসী তার বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নামতে হবে বনহুরকে।

বনহুর নিজকে প্রস্তুত করে নিয়েছে কিন্তু আশা কোথায়? তাকে খুঁজে পায় না সে অনেক খোজাখুঁজি করেও।

বনহুর যখন আশার সন্ধান করছিলো তখন মতিলাল এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে—তোমার বন্ধু কোথায় জ্যোতিলাল, তার কাছে বিদায় চেয়ে নাও!

বনহুর বললো—তাকেই খুঁজছি। বিদায় নেবো তার কাছে কিন্তু তাকে তো দেখছি না!

মতিলালের মুখোভাব লক্ষ্য করে বনহুর বুঝতে পারলো, সেও জানে ন আশা কোথায় গেছে বা কোথায় আছে। এদিকে সময় আর বেশি নেই, জাহাজখানা তীরের দিকে এগুচ্ছে।

বন্ধ্যা জঙ্গল এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জমাট অন্ধকার লাগছে ভিতরটা, কেমন যেন একটা ভীতিভাব বিরাজ করছে সেখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা বন্ধ্যার তীরে এসে লাগলো। অবশ্য সম্পূর্ণ তীরে না ভিড়লেও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো জাহাজখানা। একখানা বোট নামানো হলো। সেই বোটে মতিলাল বনহুরকে নামার জন্য নির্দেশ দিলো, সে নিজেও নামবে বলে জানালো তাকে। বন্ধ্যা জঙ্গলে তাকে পৌছে দিয়ে ফিরে আসবে এবং তার ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে মতিলাল জাহাজ নিয়ে।

বনহুর তার কথা শুনে একটু হাসলোমাত্র, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে নামানো বোটখানায়। মতিলাল ও বনহুর পর পর নেমে এলো বোটে। বনহুরকে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা দিয়েছিলো মতিলাল, বলেছিলো কোনো বিপদ এলে এটা ব্যবহার করবে।

বনহুর নীরবে ছোরাখানা হাতে নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছিলো। একটা দুশ্চিন্তার ছায়া তখন তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো—তা হলো আশার অন্তর্ধান।

মতিলালও বনহুরের পশে এসে বোটখানার উপরে দাঁড়ালো। যন্ত্রচালিত বোট, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না। অল্পক্ষেণই তারা পৌছে গেলো বন্ধ্যা জঙ্গলের পাশে হিমসাগর তীরে।

ভোরের সূর্য তখন হিমসাগরের বরফ চাপগুলোর উপরে রূপালী আলো ছড়াচ্ছে।

তীরে নামতেই বিরাট একটা কালসাপ ছোবল মারবার জন্য এগিয়ে এলো! অল্পের জন্য বেঁচে গেলো বনহুর। মতিলাল তখনও বোট থেকে নামেনি। বনহুর সাপটাকে লক্ষ্য করে তার ছোরাখানার নিক্ষেপ করলো।

মতিলাল অবাক হয়ে গেলো জোতিলালের ছোরা নিক্ষেপ দেখে। ছোরাখানা সাপটার ঠিক ফনার মাঝখানে বিদ্ধ হয়েছে। গেঁথে গেছে মাপির মধ্যে ছোরাটা।

কিছুক্ষণ সাপটার দেহ আঁকাবাঁকা হয়ে মাটিতে আছাড় খেলো, তারপর নীরব হয়ে গেলো।

বনহুর একটানে ছোরাখানা খুলে নিয়ে হিমসাগরের পানিতে ধুয়ে আবার যথাস্থানে গুঁজে রাখলো।

মতিলাল হেসে বললো—দেখলে তো তোমার সঙ্গের তাবিজটার কত গুণ।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

মতিলাল পুনরায় সংকেতপূর্ণ কাগজখানার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলো, কাগজে যেভাবে ইংগিত করা আছে ঐভাবে যেন সে অগ্রসর হয়। সাফল্য লাভ করে ফিরে এলে অগাধ ঐশ্বর্য, অর্থ আর সুন্দরী এক নারী লাভ করবে সে, তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর শুধু মাথা দোলালো।

মতিলাল বনহুরকে বন্ধ্যা জঙ্গলে বিদায় দিয়ে আবার বোটে চেপে দাঁড়ালো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে হাত নাড়তে লাগলো মতিলাল।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

মতিলাল জাহাজ ফিরে এসে সঙ্গীদের নিয়ে তার গোপন ক্যাবিনে হাতল বিহীন চেয়ারে বসলো।

অগ্নিকুন্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মতিলাল ও তার সঙ্গীদের এক একজনকে হিংস্র জন্তুর মতই মনে হচ্ছিলো।

মতিলাল অট্টহাসি হেসে উঠে—হাঃ হাঃ হাঃ, আমি কি এতই বোঝা যে আসল তাবিজ দেবো। বুক পকেট থেকে একটি ছোট সোনার তাবিজ বের করে হাতখানা মেলে ধরে সকলের সামনে—এই সেই তাবিজ, যে তাবিজ সঙ্গে থাকলে সাপ বা কোনে ভয়ঙ্কর জীবজন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

একজন বলে উঠলো—সর্বনাশ, জোতিলাল তাহলে মারা পড়বে যে!

তাতে আমার কি হলো! যদি সে নীল পাথর আনতে পারে ভাল, নাহলে শেষ চেষ্টাতো আমাকেই করতে হবে। আমি ওর জন্য এক সপ্তাহ বিলম্ব করবো, তারপর আবার আমি নিজে রওয়ানা দেবো, বুঝলে?

হ্যাঁ বুঝেছি। বললো তার সঙ্গীদল।

ঐ মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেলো আড়ালে।

গহন জঙ্গল।

বনহুর জীবনে বহু জঙ্গল দেখেছে কিন্তু এত ভয়ঙ্কর জঙ্গল সে দেখেনি। বন্ধ্যা নাম তার সার্থক হয়েছে, সূর্যের আলো এতটুকু প্রবেশের পথ নেই। দিনের বেলাতেও যেন চারদিকে জমাট অন্ধকার বিরাজ করছে।

বনহুর কয়েক পা এগুতেই একটা শব্দ তর কানে এলো—সাঁ সাঁ শব্দ। যেন ইলেকট্রিক ফ্যান চলছে কোনো অফিস-রুমে।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর, ভিতরে প্রবেশ করবে না ফিরে যবে সে আবার সেই জাহাজে? কিন্তু তা হয় না, মতিলাল তাকে তাবিজ দিয়েছে। বনহুর সংকেতপূর্ণ কাগজ, তাবিজটা পকেটা থেকে বের করে দেখে নিলো। এ তাবিজ সঙ্গে থাকলে কোনো বিপদ নাকি তাকে সম্পর্শ করতে পারবে না।

তাবিজ আর ম্যাপখানা পকেটে রাখলো বনহুর। অগ্রসর হলো সে ধীর পদক্ষেপে।

কয়েক পা এগুতেই শব্দটা আরও জোরে শোনা গেলো। কেমন যেন উৎকট শব্দ। তবু ক্ষান্ত হলো না বনহুর, কারণ তাকে যেতেই হবে, নীল পাথর তার চাই।

বনহুরের মনে বারবার ভেসে উঠছে আশার কথা, বিদায় মুহূর্তে সে গেলো কোথায়! একটিবার তার দেখা কামনা করেছিলো বনহুর।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই, বনহুরের দৃষ্টি সম্মুখে। উঁচুনীচু অসমতল পথ, অন্ধকারে হোঁচট খাচ্ছিলো সে, ভারী বুট থাকায় পায়ে কোনো আঘাত লাগছিলো না।

এগুচ্ছে বনহুর।

গভীর অন্ধকার, কোথাও বা একটু হাল্কা ধরনের আলো ছড়িয়ে আছে। বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে বনহুর।

শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, হঠাৎ বনহুর মাথার উপরে শব্দটা শুনতে পেলো। বিস্ময়ে শিউরে উঠলো সে উপরে তাকিয়ে। একটা বিরাট

আকার বাদুড় গছের ডালে বসে পাখা নাড়ছিলো আর মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করছিলো। এতক্ষণ বনহুর সেই শব্দই শুনতে পাচ্ছিলো। সেকি ভীষণ চেহারার বাদুড়টা, বনহুর বুঝতে পারলো বন্ধ্যা জঙ্গলে এই সেই রক্তপায়ী বাদুড়।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিলো!

বাদুড়টা তাকে দেখে ফেলেছে, দোল খাচ্ছে সে গাছটার ডালে আর তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

এগুবে কিনা ভাবছে বনহুর। এখন ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। সমস্ত দিন ধরে সে অনেক পথ এসেছে। বনহুর কোমরের খাপ থেকে ছোরাখানা খুলে নিলো দ্রুত, ঐ মুহূর্তে রক্তপায়ী বাদুড়টা সাঁ করে নেমে এলো তার মাথার উপর। মুখটা বাড়িয়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছেরা দিয়ে আঘাত করলো। বাদুড়টার মুখে চোট লাগায় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো সে। পাখা আর পা দিয়ে আক্রমণ চালালো।

বনহুর পড়ে গেলো মাটিতে।

বাদুড়টা সাঁ সাঁ শব্দ করছে আর দু'পা বাড়িয়ে দিচ্ছে বনহুরের দিকে। বনহুর প্রাণপণে তার হাতের ছোরাখানা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

বাদুড়ের সঙ্গে শুধু একখানা ছোরা নিয়ে পেরে উঠা বড় মুস্কিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবু বনহুর মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলো। বাদুড় বারবার তাকে আক্রমণ করছে, কেনোক্রমে একবার ওর দেহে বসতে পরলে আর রক্ষা নেই। গলায় ফুটো করে সব রক্ত শুষে নেবে সে বনহুরের দেহ থেকে কিন্তু পারছিলো না, বনহুর ছোরা দিয়ে বারবার আঘাত হানছিলো বাদুড়টার পাখায় গলায় পায়ে।

ক্রমেই বনহুর শিথিল হয়ে আসছিলো, হাত দু'খানা তার অসাড় হয়ে পড়ছে যেন। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো বনহুর। বাদুড়টার শরীর থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

ঠিক বনহুর যখন রক্তপায়ী বাদুড়টার সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করছিলো, ঐ মুহূর্তে হঠাৎ বাদুড়টার শরীরে একটা তীর এসে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝাপটে একপাশে পড়ে গেলো বাদুড়টা ঘুরপাক খেয়ে।

বনহুর অবাক চোখে দেখলো বাদুড়টা মাটিতে পড়ে ছটফট করে লুটোপুটি খাচ্ছে। দ্রুত উঠে পড়লো বনহুর, এগিয়ে গেলো বাদুড়টার পাশে, অবাক হয়ে দেখলো বাদুড়টার পাঁজরে একটা সূতীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হয়ে আছে।

এই গহন বনে তীর এলো কি করে, অবাক হবার কথাই বটে। বনহুর চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও মানুষ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ততক্ষণে বাদুড়টা নীরব হয়ে গেছে।

বনহুর তীরখানা বাদুড়ের দেহ থেকে তুলে নিলো হাতে। মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ দিলো সে।

আবার চলতে শুরু করলো বনহুর।

তার সঙ্গে কিছু খাবার এবং পানীয় ছিলো।

বাদুড়টা পড়ে রইলো পিছনে, অনেক দূর এগিয়ে গেলো বনহুর। এই তীব্র শীতেও বনহুরের দেহ থেকে ঘাম ঝরছে দরদর করে। বারবার কপালের ঘাম মুছে ফেলছে সে ডান হাতের আংগুল দিয়ে।

এত বিপদেও বনহুরের মুখে এটুকু ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন নেই। যে কাজে সে অগ্রসর হয়েছে সে কাজ তাকে সমাধা করতেই হবে।

বনহুর এবার একটা গাছের নীচে বসে পড়লো, অত্যন্ত পিপাসা বোধ করছিলো সে তখন।

সবেমাত্র পানির পাত্র বের করে পানি পান করবে ঠিক ঐ সময় বিরাট একটা সাপ এগিয়ে আসছে তার দিকে দেখতে পেলো। পানি পান করা আর হলো না, দ্রুত উঠে দাঁড়ালো বনহুর, এই মুহূর্তে তার কাছে রিভলভার থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিলো। একখান ছোরামাত্র তার সম্বল।

বনহুরের তাবিজের কথা মনে হলো, তাবিজটা সঙ্গে থাকলে নাকি কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু কই, তাবিজ তার নিকটা থাকা সত্ত্বেও তাকে বারবর বিপদে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু তবিজের কথা ভাববার সময় এখন তার নেই, সাপটা তার ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি ধরে এগিয়ে আসছে।

এবার বনহুর ছোরা নিক্ষেপ না করে একটা পাথরখন্ড তুলে নিলো হাতে, তারপর সাপটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো পাথরটা।

বনহুরের লক্ষ্য অব্যর্থ হলো, পাথরখন্ডটা সাপটার মাথায় গিয়ে পড়লে। মাথাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেলো পাথরখন্ডটার নিচে।

সাপটা আর মাথা তুলতে পারলো না, দেহটা ওর ছটফট করতে লাগলো। ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো একটা বিরাট অজগর হা করে এগুচ্ছে, যেন একটা গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। অজগরের চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের গোলার মত। কি ভয়ঙ্কর! বনহুর একদন্ড বিলম্ব না করে সাপটার দেহ লক্ষ্য করে আর একটি পাথর ছুঁড়ে মারলো।

পাথরখন্ডের আঘাতে সাপটা একটুও ঘায়েল হলো না, সে যেমন এগুচ্ছিলো তেমনি এগুতে লাগলো। সাপটা এগুচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছে। সাপটা অত্যন্ত বিরাট আকার, সে অনায়াসে বনহুরকে গিলে ফেলবে ততে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর পুনরায় আর একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো কিন্তু সাপটা এক চুল ও নড়লো না, সে যেমন ভাবগম্ভীরভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিলো তেমনি আসতে লাগলো।

এবার বনহুর ছোরাখানা খুলে নিলো কোমরের বেল্ট থেকে। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, শেষ সম্বল তার ছোরাখানা নিক্ষেপ করবে সে, ঠিক সেইক্ষণে একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো বিরাট অজগরের মাথার মধ্যে।

বনহুরের হাতে ছোরাখানা থেমে গেলো, অবাক হয়ে তাকলো সে।

সাপটা তখন ওলট পালট করছে, যন্ত্রণায় মাথাটাকে আছাড় দিচ্ছে সে মাটির সঙ্গে।

বনহুর রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে সে সাপটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটা নীরব হয়ে গেলো।

এবার বনহুর চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—এই গহন বনে কে তীর নিক্ষেপ করলো! কোথায় সে, কি তার উদ্দেশ্য?

বনহুর এবার পানির পাত্র থেকে পানি পান করে আবার চলতে শুরু করলে।

পিছনে পড়ে রইলো মৃত সাপ দুটো।